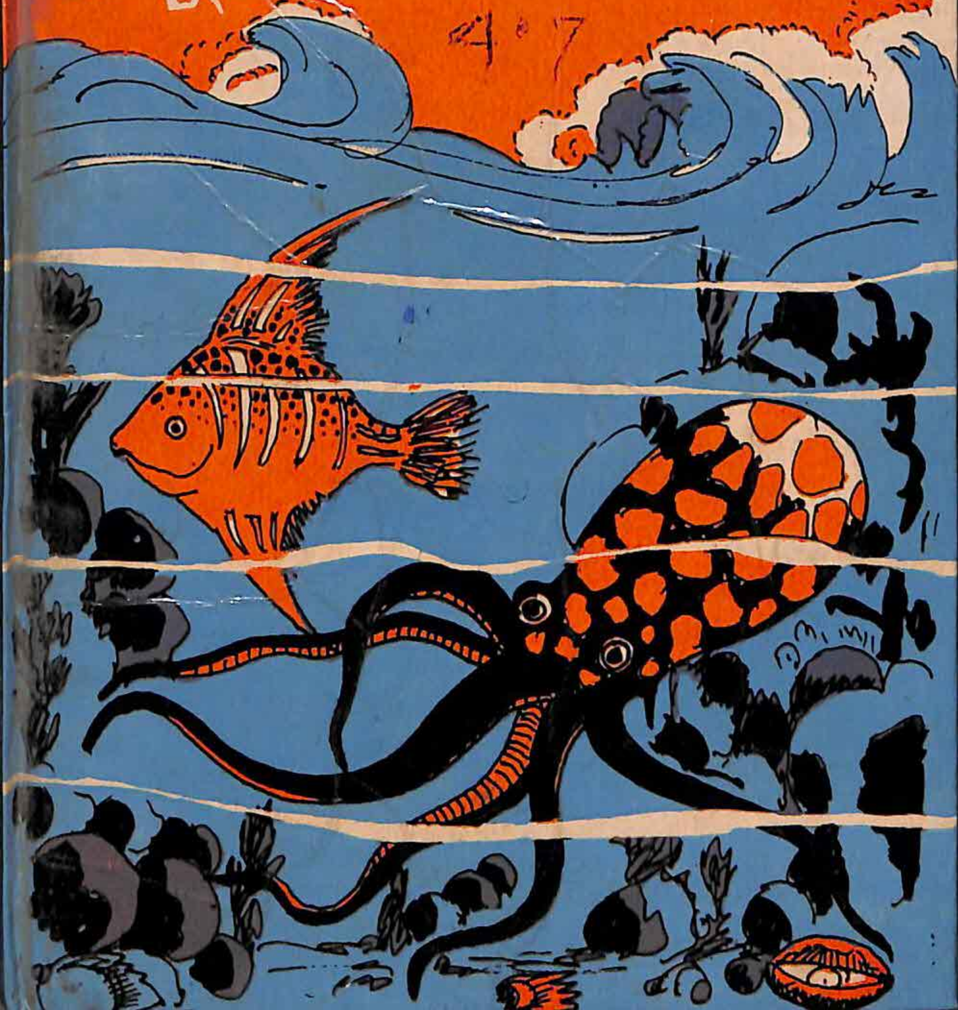
গোবিন্দ বর্মন

চলো যাই সমুদ্রতলদেশে



চলো যাই সমুদ্র তলদেশে

৩৮০

গোবিন্দ বর্মণ

বর্ণালী
৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

CHALO JAAI SAMUDRA TALADESHE

A book of marine life

By

GOBINDA BURMAN

প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৮৪

প্রকাশক : শ্রীকান্তি রঞ্জন ঘোষ
'বর্ণালী'
৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড

মুদ্রক : অজিত কুমার চৌধুরী সাধনা প্রেস
৬৩-এ তারক প্রামাণিক রোড কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদশিল্পী : পঞ্চানন মালাকর

Acc No- 14925

© শ্রীমতী ডালিয়া বোস ও মহুয়া ঘোষ

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র

উৎসর্গ

কমল ও কুমকুম
—স্নেহভাজনেষু

দেশ, মহাদেশ, সাগর ও উপসাগর-এর উপরিভাগে গবেষণার কাজ চালিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। তবুও এখনো বলা যায়, পৃথিবীর উপরিভাগের অর্দ্ধেকের বেশীই আবিষ্কৃত হয়নি কখনো। কারণ, পৃথিবীর অনেক অংশ জুড়ে এখনও সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে। আর এই তলদেশের রহস্যময় সমুদ্র-জগৎ নিজের চোখে দেখার জন্য অনেক দুঃসাহসী মানুষকে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে শংকাহীন মানুষ ছিলেন উইলিয়ম্ বীব্ (William Beebe)। বীব্ ছিলেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এবং আবিষ্কারার্থে ভ্রমণকারী। তিনি উনিশশো খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এক বিজ্ঞানীর দল পরিচালনা করে নিয়ে যান মেক্সিকো, সাউথ্ আমেরিকা এবং এশিয়ায়। পক্ষী বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকায় এবং এই কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি এই দল পরিচালনা করেন। পৃথিবীর সমুদ্রগুলির অতল গভীরে যে-সব রহস্যময় প্রাণী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, সেই সব রহস্যময় প্রাণী সম্বন্ধে জানার প্রচণ্ড মোহ ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর এই সামুদ্রিক জীবন সম্বন্ধে গবেষণার কাজ ব্যাহত হয় এই কারণে যে, গভীর সমুদ্রে যাওয়ার মতো কার্যকরী চেম্বার অর্থাৎ বাকশো-কামরার অভাব ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রসঙ্গক্রমে একদিন তাঁর বন্ধু প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুশভেল্ট প্রস্তাব দিলেন যে, গোলকাকার ডুবো চেম্বার-এর ব্যবস্থা করতে। কিন্তু যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা না থাকায় উনিশশো তিরিশ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এই পরিকল্পনা স্থগিত রইল।

তারপর রুশভেল্ট মারা যান। তার কয়েক বছর পরে ওটিস্ বারটন্ (Otis Barton) নামে উদ্ভাবনে দক্ষ এক যুবক ইন্‌জিনিয়ার-এর সঙ্গে বীব্-এর সাক্ষাৎ হয়। বীব্-এর বয়স তখন একান্ন বছর। তিনি নিউ ইয়র্ক জুলোজিক্যাল্ সোসাইটির ট্রপিক্যাল্ রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর। তাঁর সামুদ্রিক জীবনের মোহ সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল। বছরের পর বছর ধরে তাঁকে নানারকম নক্‌শা উপহার দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সবই অত্যন্ত জটিল এবং অকার্যকরা। সত্যিকারের কার্যকরী জিনিস না পাওয়াতে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় বারটন্ তাঁর অফিসে পদার্পণ করলেন, এবং প্রকৃত কার্যকরী একটি বাকসো-কামরার 'ব্লু-প্রিণ্ট' নকশা তাঁর টেবিলে মেলে ধরলেন। বীব্ তাঁর নকশা দেখে মহাখুশী হলেন। তাঁর কলা-কৌশলের বাহ্যিক সীমারেখা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল, একটি শক্ত লোহার তারের প্রান্তে সংলগ্ন একটি ফাঁপা ইস্পাতের গোলাকার বাকসো-কামরা। বীব্-এর বুঝতে এতটুকু কষ্ট হল না যে, এই গোলাকার বস্তুর উপরের স্তরেই জলের চাপ ছড়িয়ে পড়বে। বারটন্ যখন তাঁর নকশার সম্পূর্ণ বিবরণ দিলেন বীব্-এর কাছে, তিনি তখন বারটন্-এর যুক্তি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মেনে নিলেন। কারণ, তিনি বুঝলেন যে, সমুদ্রের তলদেশে যাওয়ার এটাই প্রকৃত কার্যকরী জলযান।

সোয়া এক ইঞ্চি চওড়া ইস্পাতের পাত দিয়ে এই গোলাকার বস্তুটি নির্মিত। স্ফটিক গালানো স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী এর জানালাগুলি। যেটি সবচেয়ে শক্তিশালী স্বচ্ছ পদার্থ বলে পরিচিত। তিন হাজার পাঁচশো ফিট্ লম্বা ইস্পাতের তারের সঙ্গে এটি ঝোলানো থাকে। যে

তার মোচড় খায় না। এর সঙ্গে থাকে শক্ত রবারের তৈরী নল। এই নলের ভিতরে থাকে ইলেকট্রিক লাইট্ এবং রেডিও-টেলিফোনে সংবাদ প্রেরণের তারগুলি। বীব্ এর নামকরণ করেছিলেন—বেদি স্ফিয়ার (Bathy Sphere)। ছুটি গ্রীক শব্দ—যার ইংরাজী অর্থ হল —Deep and Ball—যা থেকে তিনি এই নামকরণ করেছিলেন। যাই হোক্, উনিশশো তিরিশ গ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি সমুদ্রের তলদেশে নামার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ-এর কিছু দূরে একটি পয়েন্ট তিনি বেছে নিলেন। জুন মাসের ছয় তারিখে তিনি আর বারটন্ বেদি-স্ফিয়ার-এ করে নামলেন সমুদ্রের তলায়। তুই ডুবুরি মাথায় পরে নিলেন টেলিফোনের হেড্-সেট্ অর্থাৎ সংবাদ গ্রাহক-যন্ত্রাদিসহ মাথার পরিধান। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি ইলেক্ট্রিক পাখা, যা অক্সিজেন ট্যাংক থেকে বাতাস ছড়াবে। আর ছিল সোডা আর চূনের বেশ কিছু ট্রে, যা নিঃশ্বাস নিঃসৃত কার্বন ডায়োক্সাইড্ মুক্ত করবে। পঞ্চাশ ফিট্ নামার পর বীব্ চিন্তা করলেন, জলে ডোবার মুখোশ পরে তিনি এই গভীরতা পর্যন্ত এর আগে নেমেছেন। তার নিচে আর কখনো নামেন নি। সাতশো ফিট্ নামার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে, কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিরাই তলিয়ে আছে এই গভীরতায়। তারপর তাঁরা আটশো ফিট অবধি নামলেন। এতেই প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। এরপর তাঁরা উপরে উঠে আসেন।

আবার তিনি বারটনকে নিয়ে দ্বিতীয় ট্রিপ দিলেন জুন মাসের এগারো তারিখে। এবারে নামলেন এক হাজার চারশো ছাব্বিশ

ফিট্ অবধি। জলের নিচে প্রায় পৌনে এক মাইল-এরও বেশী। এই সময়ে বীব্ সামুদ্রিক জীবন এবং বিভিন্ন স্তরের জলের রঙ পরিবর্তনের পুংখানুপুংখরূপে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলেন। এটা ছিল একটি মনমুগ্ধকর অতল জগৎ—যেখানে দু'জন আবিষ্কারক অনুভব করলেন যেন মহাকাশে বিচ্ছিন্ন পরমাণুসমূহ। সমুদ্র-গর্ভে এই দফার অবতরণে এই নির্দেশ ছিল যে, বীব্ যেন এন্. বি. সি. রেডিয়োর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সেই ইস্পাত-গোলকের ছোট জগৎ থেকে উপরের জগতে বেতার-বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে যা দেখছিলেন, সম্পূর্ণরূপে সম্মোহিত হয়ে সেই সব প্রজাতির প্রাণীবিদ্যাগত নাম বলতে সুরু করলেন। অবশ্য যে-সব প্রজাতি তিনি চিনতেন। এই নামের তালিকা কিন্তু অধিকাংশ শ্রোতার কাছেই বোধগম্য হল না।

ইস্পাত-গোলকের ভিতরে বসে বীব্ আর বারটন্ সবশুদ্ধ পাঁচবার সমুদ্র-গর্ভে অবতরণ করেছেন। আর তিন হাজার আটশো ফিটের রেকর্ড করার মতো গভীরতা অবধি পৌঁছেচেন। যেটি পরবর্তী পনের বছরের মধ্যেও অতিক্রান্ত হত না, যদি বারটন্ একা নামতেন। বীব্-এর কিন্তু রেকর্ড করার দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাঁর একমাত্র উচ্চাকাংক্ষা ছিল, নতুন প্রজাতির আবিষ্কার এবং তাদের অদ্ভুত আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। স্ফটিক জানলার পিছন দিয়ে যে-সব প্রাণীরা অতিক্রম করেছে, তার অধিকাংশই জীবিত বা মৃত অবস্থাতেও তাঁরা আগে কখনো দেখেননি। অতএব, তাদের কোন নামও ছিল না। তাই বীব্ উত্তর পুরুষের জন্য তাদের ফটো তুলে, তাদের শ্রেণী বিভাগ করে, নামকরণ করে প্রাণীবিদ্যাগত গবেষণার

কাজে বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

ইস্পাত-গোলকে করে প্রতিবারই যখন বীব্ আর বারটন্ জলের তলায় নেমেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, মহা-সমুদ্রের অতল গভীরতায় চিরকালের মতো তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে এতে। এই কারণে যে, ব্যর্থতার নিরাপত্তামূলক কোন সাহায্যের উপায় ছিল না ইস্পাত-গোলকে। কারণ, জলে ভেসে থাকার মতো ক্ষমতা এর ছিল না। আর যদিও অবতরণকালে কোন রকমে ব্যর্থতা আসে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে জলের উপরের স্তরে ওঠার মতো যোগ্যতাই এর থাকবে না। সুতরাং এই সরু তারের বাঁধন যদি কোন রকমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে মহাসমুদ্রের তলদেশে তলিয়ে গিয়ে সমুদ্র-বিছানায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। এবং পুনরুদ্ধারের কোন আশা থাকবে না। আর অক্সিজেন্-এর ট্যাংক যখনই নিঃশেষিত হবে, এই দুটি মানুষকে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। আশ্চর্যজনকভাবে, আবিষ্কারক-গবেষক এই দুটি মানুষের মনে এ চিন্তা আসেনি। যা' এসেছিল মিসেস্ বীব্-এর মনে। তাঁর চিন্তায় যা' জেগেছিল, তারই পরি-প্রেক্ষিতে তিনি পরে তাঁর পরিকল্পনার কথাও উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল যে, সার্কাস-এর দড়িবাজিকররা যেমন নিজেদের রক্ষা করার জন্য প্রচুর ইস্পাত-এর তৈরী জাল ব্যবহার কোরে নিজেদের রক্ষা করে, সেই রকম ইস্পাতগোলক এবং তার সংলগ্ন ইস্পাতের তার উভয়কেই এই রকম ইস্পাতের জাল দিয়ে জড়িয়ে তারে বেঁধে নামানো হলো না কেন? তাহলে তো আর বিপদের ঝুঁকি থাকত না। এর সোজা উত্তর হল—তাঁর আগে এটা কেউ যে চিন্তাই করেন নি।

যাই হোক, এখন যাওয়া যাক্ সমুদ্রের তলদেশে। দেখা যাক, সেখানে কত রকমের প্রাণী বিরাজ করছে। আর তাদের গতিবিধি বা আচার-আচরণই বা কি রকম। সেখানে কত জল, কত জলজ গাছপালা, আর কত রকমের রত্নমালা আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এখন দেখা যাক্ সেই অসীম, চঞ্চল এবং নিরাকার মহাসমুদ্রকে। ভেদ করা যাক্ এবার এর নিগূঢ় রহস্য।

পৃথিবীর তিন ভাগ হল জল। এই জলেই মিশে আছে যতো নদী, উপনদী, সাগর, উপসাগর ও মহাসাগর। এরা ধরে আছে এক অচিন্তনীয় জলের পরিমাণ। যার মাপ হবে সম্ভবতঃ তিন হাজার তিনশো লক্ষ, লক্ষ-কোটি গ্যালন। এক অপরিমেয় দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধের এই জলজগৎ।

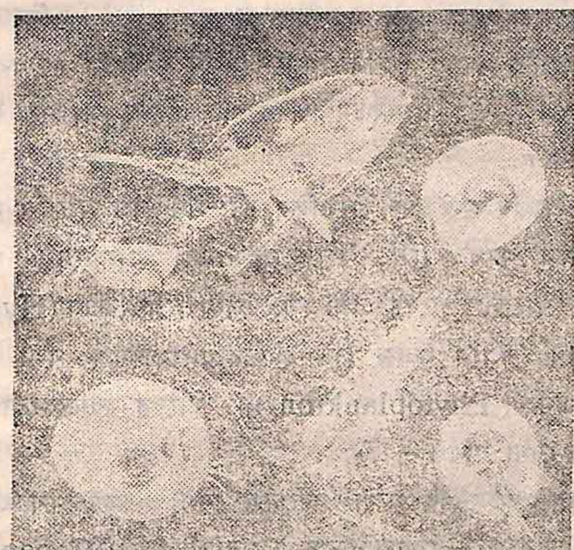
যে বৃহত্তম গভীরতা অবধি মানুষ বর্তমানে কৃতকার্যের সঙ্গে অবতরণ করতে সমর্থ হয়েছে, সেটা প্রশান্ত মহাসাগরে মারিয়ানা ট্রেন্চ্-এ। সাঁইত্রিশ হাজার আটশো ফিট্ হল এর গভীরতা। মাউন্ট এভারেষ্ট-এর চেয়েও আরো প্রায় দশ হাজার ফিট্ বেশী এর গভীরতা।

মানুষ সমুদ্রকে প্রায় সব সময়েই ভয়ের চোখে ধরে রেখেছে। অথচ, তার খাদ্য সরবরাহের কৃপাময় দানের দ্বারাই অনেকে জীবন ধারণ করত এবং তার ভয়ংকর শক্তি ও অদমনীয় রোষ দেখেও মানুষ বিস্মিত। তবুও মানুষ তার বিভিন্ন ধরণের প্রাণীজীবন দেখে বিমুগ্ধ। ছবিতে আপনারাও দেখুন সেই সব বিস্ময়কর লতাগুল্ম, গাছপালা ও প্রাণীজীবন। আপনারাও আবিষ্কার করুন তাদের রহস্যবিজড়িত ও বিস্ময়কর সব দেহাবয়ব, চমকপ্রদ বর্ণসম্ভার, মনমুগ্ধকর তাদের চলা-

চলের ভঙ্গিমা, আশ্চর্য রকমের খাওয়া ও খাওয়ানোর পদ্ধতি। আর অদ্ভুত সব জলের দেশের যাদুকরী বাগিচা।

প্ল্যাংক্‌টন্

প্রথমেই সুরু করা যাক্ প্ল্যাংক্‌টন্ নিয়ে। প্ল্যাংক্‌টন্ (Plankton) শব্দটি গ্রীক শব্দ Plagktos থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল ভ্রাম্যমাণ। এই প্ল্যাংক্‌টন্ জলের উপরের স্তরেও থাকে। আবার অতল গভীরেও থাকে। এরা স্রোতের মুখে ভেসে বেড়ায়,



প্ল্যাংক্‌টন্

অথবা উপরের স্তরে ভাসমান্ অবস্থায় থাকে। এরা সর্ব অঙ্গ নিয়ে

কর্মশীল কিছু জীবন্ত প্রাণী। এরা কখনও বিজড়িত অবস্থায় বলের আকারে অবস্থান করে, এবং কখনও স্বতন্ত্রভাবে চলাচল করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদের শারীরিক গঠন দেখতে হয়। এই প্রাণীকুলকেই বলা হয় প্ল্যাংক্‌টন্।

যাই হোক্, উপরের স্তরের প্ল্যাংক্‌টন্-এর থেকে নিচের স্তরের প্ল্যাংক্‌টন্ অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং উজ্জ্বলতর। স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য এদের স্রোতের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। এরা এমন এক জগতে বাস করে, যা সাধারণতঃ লোকচক্ষুর আড়ালে লুক্কায়িত। এরা অতি ক্ষুদ্র ও দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। নিজেদের চলাচলের উপরে এদের কোন নিয়ন্ত্রণ শক্তি নেই। এই ধরনের লতা-গুল্মকেও আবার প্ল্যাংক্‌টন্ বলা হয়। যাদের আকার এদের মতোই বিভিন্ন।

যেগুলি প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। যারা জলের উপরের স্তরে থাকে, তাদের বলা হয় প্ল্যাংক্‌টন্। যারা গভীর স্তরে থাকে, তাদের বলা হয়, হাইপোপ্ল্যাংক্‌টন্ (**Hypo-plankton**)। আর জলজ লতা-গুল্মের প্ল্যাংক্‌টন্‌কে বলা হয়, ফিটোপ্ল্যাংক্‌টন্ (**Phytoplankton**)। যাদের রৌদ্রকরোজ্জ্বল উপরের স্তরে দেখা যায়।

হাইপোপ্ল্যাংক্‌টন্-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাণীগুলি আছে, তারা হল—কোপ্‌পড্‌স্ এবং অসট্রাকড্‌স্ (**Copepods and Ostracods**)। কোপ্‌পড্‌স্ হল—যার দাঁড়ের মতো পা আছে। এটি হল গ্রীক শব্দ। আর অস্‌ট্রাকড্‌স্ হল—ঝিনুকযুক্ত একপ্রকার সামুদ্রিক মৎস্য অথবা কড্ মাছ। এটিও গ্রীক শব্দ

অস্ট্রিয়ন্ (Ostreon) থেকে এসেছে। কোপ্ পড্ স্ দেখতে যেন লাল পোষাক পরিহিত। কখনো কখনো দেখা যায়, লালচে-বেগুনি রঙ সমন্বিত এক অপূর্ব সুন্দর জীব। আবার কখনো তাদের দেখা যায়, উজ্জ্বল হলুদ এবং কমলা রঙের পুচ্ছ সমন্বিত— ঠিক যেন টুপীর মতো। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হয় দাঁড়ের মতো।

এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে কোপ্ পড্ স্ সাবালক হয়। এরা নপ্লিয়াস (Nauplius) নামক শূক-কীটের ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। বার বার ফাটতে ফাটতে ডিমের ভিতর থেকে এরা বেরিয়ে আসে। একেবারে সম্পূর্ণরূপে কোপ্ পড্ স্-এর আকার নিয়ে। বাচ্চা ফোটার সময় যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাদের লালা-গ্রন্থির সাহায্যে এক উজ্জ্বল চকচকে মেঘের সৃষ্টি ক'রে তাদের দেহের উপর নিক্ষেপ ক'রে তাদের সম্পূর্ণ দেহটাকে ঢেকে ফেলে। এই অদ্ভুত অভ্যেস দেখলে মনে হয় যেন কেউ খিটখিটে মেজাজ নিয়ে তর্জ্জন-গর্জ্জন করে চলাফেরা করছে। যেহেতু তারা মৎস্য এবং ফিটোপ্ল্যাংকৃটন্-এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে খাদ্য যোগাযোগ রক্ষা করে, যে ফিটো-প্ল্যাংকৃটন্‌কে বলা হয়, সমুদ্রের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণী ; সেই হেতু কোপ্ পড্ স্ হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। মৎস্য খাদ্য যোগান দেয় কোপ্ পড্ স্‌দের। আর তারাও তার পরিবর্তে তাদের যোগান দেয় ফিটোপ্ল্যাংকৃটন্ অর্থাৎ জলজ লতাগুল্ম।

অস্‌ট্রাকড্ স্ কিন্তু বেশী সক্রিয় ও সজীব কোপ্ পড্‌দের মতো নয়। তারা একাকী স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে আগ্রহী। তাদের দ্বিধাবিভক্ত খোলের মধ্যেই বদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত। তাদের খুব কম সংখ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলেই জানা যায়। সাতজোড়ার বেশী

নয়। সমুদ্রের খুব সাধারণ অস্ট্রাকড্স্ জাতের একটি প্রাণীকে বলা হয় কংকোসিয়া (Conchoecia)। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হল, ছোট্ট হাতীর শুঁড়ের মতো উল্লেখযোগ্যভাবে সহজেই নমনীয়। যেগুলির ধরন-ধারণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। এই শুঁড়গুলি সব দিকেই মুচড়ে বাঁকিয়ে নিতে পারে। এর প্রান্তভাগে ছোট ছোট শক্ত লোম আছে! যেগুলি দেখতে ঠিক বোতল ধোয়ার বুরুশের মতো। খোলার অভ্যন্তরভাগে এটি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করার মতো একটি আদর্শ জিনিস। আর এই কারণেই ঐ শুঁড় এই প্রাণীরা ব্যবহার করে। সত্যি কথা বলতে কি, এরা বেশ সুরুচি-সম্পন্ন এক স্বতন্ত্রপ্রাণী। এদের আবরনী খোলা সর্বদা পরিষ্কার করার মতো এই দেহযন্ত্রটি সব সময়েই সক্রিয়। খোলা যখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে, তখনও গৃহপরিচারিকার বাধ্যতামূলক কাজের মতোই অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে পরিষ্কার করে যায়।

যে অস্ট্রাকড্ বৃহত্তম বলে জানা যায়, সেটি গোলাকার কমলা রঙের এবং বেশ বয়স্ক। তাকে বলা হয় জাইগান্টোসাইপ্রিস্ (Gigantocypris)। এরা গভীর সমুদ্রের স্থায়ী অধিবাসী। এদের চোখগুলো বিরাট ধাতব প্রতিফলকের মতো। ঠিক যেন মোটরের হেড্লাইট। এদের চোখের পাতা কমলা রঙের কোটরের পিছনে খাপে ঢাকা থাকে। পরিষ্কার ও চকচকে কাঁচের জানলার মতো আধাবোজা চোখে, কোণাকুণিভাবে তাকায়—ঠিক যেন প্রথম মহাযুদ্ধের বিমান-চালক রৌদ্র থেকে রক্ষাকারী তার চশমার ভিতর দিয়ে আকাশপথ নির্ণয় করছে।

এইসব সুন্দর ও চঞ্চল প্ল্যাংক্টন্ জাতীয় রেডিওলারিয়ান্স্ এবং

ফোরামিনিফেরা (Radiolarians and Foraminifera) অর্থাৎ রশ্মিবিকিরণকারী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদেহী প্রাণী, যারা ঋতু অনুযায়ী জলের উপরের স্তরে ভ্রমণ করে, মৃত্যুর পরে গ্রাম বা সহর পারাপার দৌড়-এর মতো সমুদ্রের বুকে গড়িয়ে বেড়ায়। তাদের দেহগুলো সাগর-গর্ভে তিরিশ হাজার ফিট্ তলায় বিচরণ করতে থাকে, তাদের শেষ আশ্রয়স্থল অবলম্বন ক'রে। তাদের ক্ষরিত-জরিত কংকালগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক স্তূপ হিসাবে সেখানে নিজেদের রক্ষা করে। এদের বলা হয় তখন সমুদ্র গর্ভের পিচ্ছিল কর্দমাক্ত প্রাকৃতিক স্তূপ। যাকে ইংরাজীতে বলে উজেস্ (Oozes)। এই হল তাদের কর্মচঞ্চল জীবন এবং সীমাহীন পথপরিক্রমার পর উপযুক্ত বিশ্রাম। এদের কংকালগুলির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই এই কর্দমাক্ত প্রাকৃতিক স্তূপগুলির একটা আকার বা মূর্তি এনে দেয়। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায়, রেডিওলারিয়ানগুলির মধ্যে অর্থাৎ রশ্মিবিকিরণ-কারী বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে সিলিকা অর্থাৎ স্ফটিক চকমকি বা বালির প্রধান উপাদান সমন্বিত কঠিন কংকালসমূহ। এদের আকারও কল্পনাসাধ্য। এই মনমুগ্ধকর আকারগুলো যেন খেলনা দূরবীণ থেকে ধার করা। কেবল রঙীন কাঁচের পরিবর্তে চকচকে চকমকি পাথরের তৈরী।

আর সুদূর পরিভ্রমণকারী যাত্রীদের দ্বিতীয় দলটি হল, ফোরামিনিফেরা, যারা গ্লোবিজারিনা'র (Globigerina) অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রদেহী গোলাকার প্রাণীর প্রতিরূপ। বহুকক্ষবিশিষ্ট ঘরেতেই তাদের আস্থা। বহু পরিশ্রম করে তারা মোচাকৃতি খড়ির মতো বহিআর্বরণ বা খোলা তৈরী করে। যাতে অসংখ্য সংযোগ

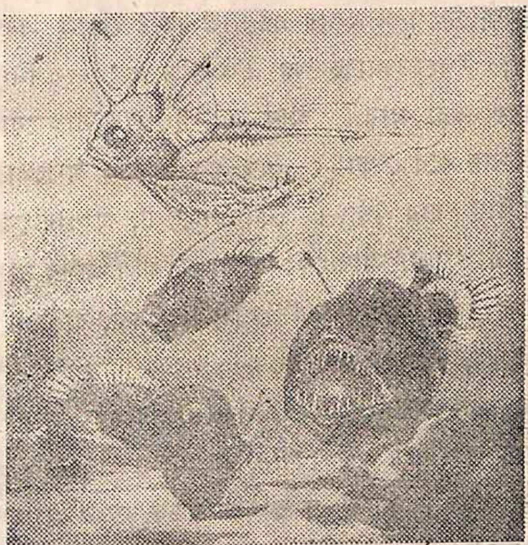
রক্ষাকারী গোলাকার কুঠরী থাকে। অবাঞ্ছিত এবং বিপজ্জনক আগন্তুকদের আক্রমণ এড়াবার এক সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল। যে কোন কারণই থাক না কেন, এই সব গোলাকার কুঠরী, যা এত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তৈরী, গ্লোবিজারিনা উজ-এর মধ্যেই রক্ষিত থাকে। ছোট ছোট সাবানের ফেনা যেন একজনের উপর আর একজন বসে আছে। দেখলে তাই মনে হয়। ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু অংশ এবং সুগভীর আট্লান্টিক্ মহাসাগরের অধিকাংশ অংশ জুড়ে এরা বিস্তৃত। প্রায় চারশো আশি লক্ষ বর্গমাইল—অতল সমুদ্রগর্ভের প্রায় অর্দ্ধেক জায়গা জুড়ে এদের বিস্তৃতি। সিলিকা এবং চুনের অমূল্য ভাণ্ডারাগার হল, এই রেডিওলারিয়ান্ এবং গ্লোবিজারিনার প্রাকৃতিক স্তূপ। যার আবিষ্কার মানুষের কাছে অভিনন্দনযোগ্য।

অ্যাংলার মাছ

অ্যাংলার (Angler) হল এক জাতীয় ব্রিটিশ দেশের মাছ। এরা গভীর সমুদ্রের এক ভূতুড়ে ও বিস্ময়কর শিকারজীবী প্রাণী। এদের বিদ্যুৎবাহী সরু তারের মতো মাথা ও মুখের উপরে রশ্মি-বিকিরণকারী শুঁড় আছে। যা' দিয়ে এরা অন্য মাছকে আকর্ষণ ক'রে তাদের ভক্ষণ করে। যৌবন ও শৈশব কালটাই হল, এদের অস্থায়ী সৌন্দর্যের কাল। সত্যিই এটা আশ্চর্য লাগে যে, অনেক মাছই এই কালটাতে তাদের বাপ-মায়ের মতো দেখতে নয়। গভীর সমুদ্রের এই অ্যাংলার মাছই তার স্পষ্ট উদাহরণ।

এদের ডিমে তা' দেওয়ার পর একটা চমৎকার জাঁকালো

অ্যাংলার-শাবকে পরিণত হয়। পরীর মতো সূক্ষ্মতা নিয়ে মাকড়সার জালের সূক্ষ্ম সরু সরু তন্তুর মতো টানা টানা ডানা গজায়। সমুদ্রের



অ্যাংলার মাছ

তলদেশ বরাবর কিছুটা উপরে জলের স্তরেতেই এলোমেলোভাবে শাবক-অ্যাংলারগুলো তাদের শৈশবকালটা কাটিয়ে দেয়, তাদের সাময়িক বন্ধু-বান্ধব হাইপোপ্ল্যাংক্‌টন্ এবং অন্যান্য মাছের ছানা-পোনার সঙ্গে। কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি এদের শৈশবকাল এবং সৌন্দর্য চলে যায়—যা আর কখনো ফিরে আসেনা। যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হ'তে থাকে, ততই ক্রমবর্ধমানভাবে এরা কুৎসিত ও দুর্বহ হয়ে ওঠে। এইভাবেই চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তখন তাদের

Acc.No-14925

দেহ হয় আকারবিহীন। শৈশবের আকর্ষণকারী চাকচিক্য আর থাকে না।

অ্যাংলার মাছকে বলা হয় গভীর জলের জেলে। গভীর সমুদ্রের এই সব সুদক্ষ জেলে-অ্যাংলার-এর খাদ্য ধরার কোন সমস্যাই নেই। এদের মাথার উপরে আছে লম্বা এক শুঁড়, যা' দিয়ে নিখুঁত ছিপের মতো শীকার করা যায়। আর এই ছিপের সাহায্যেই সুসজ্জিত হয়ে তারা মাছ ধরে বেড়ায়। এক-এক জাতের অ্যাংলার-এর এক-এক রকম মাছ ধরার ছিপ। কোনটা ছোট, আবার কোনটা লম্বা, কোনটা বা বাঁকালো, আর কোনটা বা সোজা। এদের মাপ, আকার বা মৌলিক গঠন, যে-রকমই হোক না কেন, বা যেভাবে শীকার করুক না কেন, আদি কারণ একই।

মজার কথা এই যে, এই ছিপগুলো সব সময় অ্যাংলার মাছের অঙ্গ হিসাবে ছিল না। এক রকম ডানাওয়ালা সাহায্যকারী সামুদ্রিক মাছ যখন তাদের কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন অ্যাংলার মাছের পিঠের উপরে লাগানো লম্বা ছিপের মতো অংশটি টেনে তুলে নিয়ে মাথার দিকে চলে আসতো। বিবর্তনের ফলে তারা এখন এইভাবেই জন্মায়। অ্যাংলার মাছের এটি এক অদ্ভুত ইন্দ্রিয়গোচর জিনিস। এই ভিন্নদেহী অ্যাংলার মাছের বীজজাত চারামাছগুলো যখন বড় হতে থাকে, তাদের এই অংশটিও ক্রমশ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়, এবং এক দীপ্যমান্ টোপ-এ পরিণত হয়। চাতুর্যপূর্ণভাবে গঠিত এই যাদুকরী টোপটি কৌশলে সুস্বাদু প্ল্যাংকটন্ জাতীয় খাদ্যে কামড়ের মতোই শীকারকে যাদু করার কৌশল-ক্ষমতা এদের আছে। শীকার যখন সামনে আসে, তখন এই ছিপটি মাথার উপর থেকে তুলে

পিছনে লেজের দিকে টেনে নিয়ে পিঠের উপর রশ্মিবিকিরণকারী পাইপের মতো ফেলে রাখে। এই আলোয় আকৃষ্ট হয়ে শিকার যখন নিকটবর্তী হয়, অ্যাংলার তখন হঠাৎ এক ঝাপটায় ছিপটি তুলে তাকে জড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ম দাঁতযুক্ত মুখে পুরে দেয়। আগে থেকেই অপেক্ষা করে থাকে হাঁ-করা দুষ্ট এক চওড়া মুখ।

গার্নার্ড্স্ মাছ

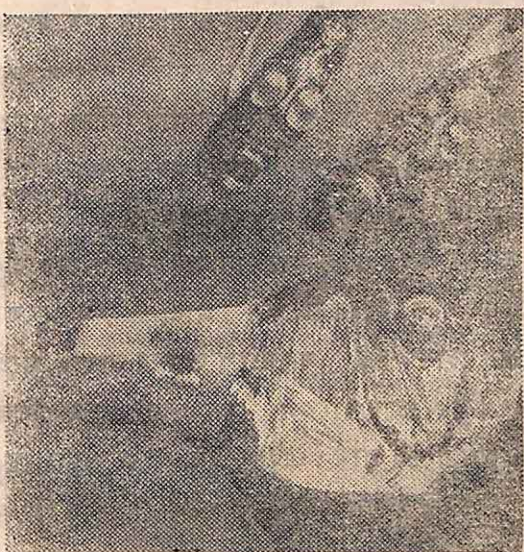
সাধারণতঃ গার্নার্ড্স্ (Gurnards) মাছ দেখা যায় গভীর সমুদ্রে। আশ্চর্য লাগে যে, এরা সমুদ্রের মেঝেতেই ঘুরে বেড়ায়। এরা হাঁটতে পারে। কারণ, এদের পা আছে। বিশেষ করে এই গার্নার্ড্স্ মাছেদের। বুকের উপরে মাথার দু'পাশে বড় পাখার মতো দেখতে দুটি করে ডানা আছে। তারই সামনে আছে তিনটি করে দু'পাশে ছয়টি অনমনীয় বাঁকানো কাঁটা। যেগুলি পায়ের কাজ করে। ঠিক যেন সরু ফলাযুক্ত ছোরা। এই কাঁটাযুক্ত পাগুলো ছয়টি ডানাওয়ালা সামুদ্রিক মৎস্যেরই রূপান্তরমাত্র। ডানাযুক্ত সমুদ্রের মাছগুলির আসল ডানা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কাঁটা বেরিয়ে এসে অদ্ভুত পা-এ পরিণত হয়। এগুলি শুধু যাতায়াতের জন্য পা-এর কাজই করে, তা নয়; এগুলি স্পর্শানুভূতিসম্পন্ন ও স্বাদগ্রহণকারী দ্বিতীয় অঙ্গেরই কাজ করে। তাই এগুলিকেও বহু উদ্দেশ্যমূলক পা বলা হয়।

এবার তাহলে এদের ভালবাসার কাহিনীটাও শোনানো যাক্। এদের পরিণত বয়সের পুরুষ অ্যাংলারদের থেকেও শিশু অ্যাংলারদের পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে অনেক বেশী মেলামেশা হয়, এবং সংখ্যাতেও

এরা প্রচুর। এই কারণে এদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগও অনেক বেশী। অতএব, প্রাকৃতিক দিক থেকে এদের যৌন মিলনও যুক্তিসঙ্গত এই অল্প বয়সেই। শৈশব-বিবাহেও এরা নিশ্চয় উৎসাহ দিয়ে থাকে। তবে, অ্যাংলারদের মধ্যেই এটা ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক বিকৃতিও আছে। পুরুষ অ্যাংলাররা বাঁচার জন্য স্ত্রী অ্যাংলারদের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যখনই পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তখনই পুরুষ অ্যাংলারটি স্ত্রী অ্যাংলার-এর যোয়ালের কাছে চামড়া চেপে ধরে এবং সেইভাবেই সংযুক্ত অবস্থায় চলতে থাকে। হয়তো সারাজীবনই এইভাবে ভেসে চলে। তবে, আবেগের মাথায় অন্য জায়গাতেও সময় সময় কামড়ে ধরে। খেয়ালও করে না তখন। হয়তো পেটে, নয়তো পাঁজরে, নয়তো জংঘার মাঝে পার্শ্বদেশে, আর নয়তো মুখেই দিয়ে বসে কামড়। শেষ পর্যন্ত কখনও কখনও আজীবন কামড়ে থাকার ফলে হয়তো দুটি শরীর জুড়েই গেল। আর তাদের রক্ত চলাচলও ভাগাভাগি হতে রইল। এটা সম্ভবও হয়। কারণ, পুরুষদের দেহ স্ত্রী-দেহের তুলনায় অনেক ছোট। ক্রমশঃ বিবর্তনের ফলে যুগে যুগে তারা আরো ছোট হচ্ছে থাকে। মহাসমুদ্রের অতল গভীরে খাদ্যাভাবের দরুণ এটা একটা স্পষ্ট সুবিধাজনক ব্যাপারও বলা যায়। স্ত্রীর সরবরাহ করা রক্তই তখন পুরুষদের খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই খাদ্যের পরিবর্তে এবং স্ত্রীদের 'হরমোন্' অর্থাৎ প্রাণীদেহজ রসে পুষ্ট হয়ে পুরুষরা তাদের গর্ভবতী করার জন্য বা ডিম সমৃদ্ধ করার জন্য শুক্রাণুসরবরাহ ক'রে থাকে। এটাই তাদের ভালবাসার একটা স্পষ্ট কাহিনী—আমৃত্যুকাল আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হই।

হ্যাচেট্ মাছ

তীব্র ও উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মাছ হল হ্যাচেট্ (Hatchet) মাছ। যে রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। মনে হয় যেন মুঠো মুঠো রৌপ্যমুদ্রা সমুদ্রের দেড় হাজার ফিট্ তলদেশে ছড়িয়ে আছে। সেগুলো কি আবার সাঁতার দিয়ে বেড়ায়? এটাও কি সম্ভব? না। উজ্জ্বল রৌপ্যের আলো



হ্যাচেট্ মাছ

বিচ্ছুরণকারী এই তালিগুলিই হল ছোট এক জাতীয় প্রাণীর ঝাঁক। যাদের বলা হয় হ্যাচেট্ মাছ। তাদের প্রায় গোলাকার রৌপ্য-

মুদ্রার মাপের দেহগুলো চ্যাপটা ও উজ্জ্বল। যা যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। আর এই দর্শনীয় সমতা সৃষ্টি করছে।

এই ছোট ছোট মাছগুলোকে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দেখলে বাস্তবিক মন মোহিত হয়ে যায়। মনে মনে একটা ছবি আঁকা যাক এবার। সমুদ্রের ঐ অতল গভীরে গোধূলির মতো অস্পষ্ট আলোয় তাদের রৌপ্যময় দিকটা কেমন আয়নার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। এমন কি তাদের দেহের নিচের অংশটাও যদি দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতে হবে। কেননা, সেখানে উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী দেহাংশ থেকে যখন সুইচ টিপে তারা আলো জ্বালাবে, তখন দু'সারি বিভিন্ন রঙের আলো জ্বলছে মনে হবে। বিমান অবতরণের সময় যেমনভাবে তাদের আলোগুলি জ্বালায়, ঠিক সেই রকম দেখতে লাগবে।

হ্যাচেট্ মাছের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা হল যে, তাদের অবতরণের আলোর গতি সব সময় নিচের দিকে। আর, তাদের বড় বড় জ্বলন্ত পাইপের মতো চোখ দুটো, যা মাপে তাদের মাথার অর্দ্ধেক, সব সময়েই উপরের দিকে চেয়ে থাকে। যেন তারা নিচের দিকে অতল গভীর জলে তাকাতে ভয় পায়; এইজন্য যে, তারা অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে। তাদের কদাকার দৈহিক গঠন এবং নিচু দিকে ঝুঁকে-পড়া বিরাট মুখ, এই দুইয়ে মিলে তাদের চেহারা অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। এটা খুব কম আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যদিও এরা পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশী বড় হয় না, তবুও বিজ্ঞানসংক্রান্ত ম্যাগাজিন-গুলিতে এদের বলা হয় যে,—'গভীর সমুদ্রের রাক্ষসদল'।

সত্যিই এদের নলাকার চোখগুলি বিশেষভাবে আকর্ষণকারী।

বেশীর ভাগ চোখগুলি, তার মধ্যে যেগুলি ঠিক মানুষের মতো দেখতে, সেগুলোশুদ্ধ সবগুলিরই সামনে একটি করে অক্ষিপট আছে। ক্যামেরা বা দূরবীণ-এর কাঁচের মতো চোখের পিছনের ঝিল্লী হল আলো-কাতর, যার উপর প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত হয়। তবে, এই নলাকার চোখের পিছনে থাকে প্রধান অক্ষিপট। আর নলের পাশে কাঁচের মতো পরদার পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাকে অপরটি। নিকটের বস্তুগুলি প্রতিফলিত হয় প্রধান অক্ষির উপরে। জোড়া অক্ষিপট থাকার ফলে এরা দূরবীণ যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারে। এই কারণেই বোধ হয় হ্যাচেট্ মাছের চলার পথ আলোকিত করার প্রয়োজন হয় না।

স্কুইড্স্

গভীর সমুদ্রের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণীদের মধ্যে স্কুইড্ (Squid) হল এক ধরণের প্রাণী। প্রফেসর চুন্ (Chun) এই প্রাণীটি আবিষ্কার করেন। তার নামকরণ করেন,—'ডীপ্ সি স্কুইড্'। উজ্জ্বল ও ভাস্বর মণি-মাণিক্য সাজানো রাজমুকুট যেন—নড়লে যার উপর প্রতিকৃতির প্রতিফলন হয়। জলের উপরের স্তরেই এদের দেখা যাক, বা গভীর জলেই দেখা যাক, রশ্মিবিকিরণ করার ক্ষমতা সব স্কুইড্-এর কাছেই একটা সাধারণ ব্যাপার। জলের ভিতর ঘন কালো পরিবেশ বলেই এরা এত উজ্জ্বল আলো দেয়, আর অল্প আলোর উজ্জ্বলতাও বেশী হয়, এটা ভুল ধারণা। যাই হোক, যা সাধারণতঃ দেখা যায় না, সেই রকম বিভিন্ন বর্ণের আলোর ছটা বিচ্ছুরিত করার ক্ষমতা এরা রাখে। এই চতুর প্রাণী স্কুইড্গুলো

তাদের সাদা আলো উৎপাদনকারী অঙ্গটির সামনে নানা বর্ণের পরদা সৃষ্টি করে রাখে। যেটি পরিষ্কার দেখা যায়।

সি পেন্

গভীর সমুদ্রের ডুবুরিরা প্রায়শই সি পেন্ (Sea pen) অর্থাৎ সামুদ্রিক কলম দেখে প্রলুব্ধ হয়ে থাকে, এবং এই সামুদ্রিক কলম তুলে এনে লেখার প্রয়াস পায়। আসলে এটা কিন্তু এক অদ্ভুত প্রাণী। একে দেখতে ঠিক মান্ধাতা আমলের চিলে-পালকের কলমের মতো। এদের সম্পূর্ণ দেহটা হল—একটা সরু দণ্ডের মাঝখান থেকে এক দিকটা পালকের মতো শাখা-প্রশাখায় ভর্তি। ছোট অপরিণতদেহী করাত মাছের মতো কাটা কাটা তার পার্শ্ব-দেহ। এই অতিপ্রাকৃত সমতার জন্য এই 'পেন্নাটুলা' অর্থাৎ পালকের কলমের মতো দেহী জীবগুলোকে সামুদ্রিক কলম বলা হয়। এদের অপরিণত দেহযন্ত্রবিশিষ্ট প্রাণীগুলোকে শিক্ষা দিয়ে এক এক করে সুদক্ষ করে তোলা হয় কয়েকটি কাজের জন্য। যেমন,—কেমন করে খাওয়াতে হয়, বংশবৃদ্ধি করতে হয়, এবং আক্রমণ করতে হয় ইত্যাদি। নিজেদের সুষ্ঠুভাবে থাকার জন্য সকলে মিলে কিভাবে একতার সঙ্গে কাজ করতে হয়, সে শিক্ষাও দেওয়া হয়।

এই সি-পেন্-এর এক অদ্ভুত আলোর উৎস আছে। তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে, এই উৎস থেকে বাড়তি আলো উৎপন্ন করাও একটা আশ্চর্যজনক কাজ। যখনই তাদের কেউ স্পর্শ করবে, তখনই তারা জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠবে। দেহের যে অংশে স্পর্শ করা হবে, সেই অংশ থেকে দেহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে সেই উজ্জ্বল

আলো। বিশেষ করে বিশালাকার সি পেন্-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক অসাধারণ দীপ্তি। বৃহৎ আলোকিত সিনেমার তাঁবুর উপরে তপ্ত আলোর কম্পমান লালচে আভার মতো ওঠানামা করে এই ঘন আলোর রশ্মিমালা। এটাই হল এদের উপস্থিতির বিজ্ঞপ্তি। এদের ছোঁয়া বা আঘাত না করাই ভাল।

র‍্যাট্-টেল্ মাছ

সমুদ্রের তলদেশে অল্পসংখ্যক যে কয়েক জাতের মাছ প্রকৃতপক্ষে বাস করে, তাদের মধ্যে এই র‍্যাট্-টেল্ বা ম্যাক্রুরাস্



র‍্যাট্-টেল্ মাছ

অ্যাকোয়ালিস (Rat-Tail or Macrurus Aequalis) তাদের

মধ্যে একটি। ছত্রিশ হাজার ফিট্ তলদেশে তারা থাকে। তারা মাপে প্রায় ন'ইঞ্চি লম্বা এবং কড্ পরিবার-এর অন্তর্ভুক্ত। এত গভীরে থাকলেও এরা দেখতে খুব তেজী ও উজ্জ্বল। যে সমস্ত মাছ দেখতে একেবারে অদ্ভুত, তাদের মধ্যে থাকলেও এটিকে দেখতে খুবই স্বাভাবিক। এই মাছগুলি জলের তলায় ইটের মতো লালচে কাদা-মাটির উপর দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়ায়। আর স্থিরভাবে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে সব সময় তাকিয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণরূপে উল্লেখযোগ্য অর্জিত বস্তু বলতে হবে। স্বাভাবিকভাবে গভীর সমুদ্রের মাছের এই চোখগুলি, যা' দেখা যায় তিন হাজার ফিট্ গভীরে, শ্রেণীহারা হয়ে যায়, বা সামগ্রিকভাবে অনুপস্থিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে র‍্যাট্-টেল্-এর এই চোখগুলি শীকার ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় কিনা ঠিক জানা যায় না। কারণ, সেখানে ফস্ ফরাস্‌যুক্ত বীজাণুর স্তর থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, যার উপরে তারা মসীবর্ণ ছায়া তৈরী ক'রে রাখে, যা' শীকারজীবীদের সহজে শীকার ধরতে সমর্থ ক'রে তোলে। এই র‍্যাট্-টেল্ বা ম্যাক্রুরাস্ অ্যাকোয়ালিস্‌রা (Macrurus aequalis) জীবনের অধিকাংশ সময় শীতল-তিমির গভীরতায় কাটায়।

র‍্যাট-টেল্ মাছদের চোখ দুটি ছাড়াও অপর একটি আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য হল, উদাসীন ও স্থিরভাবে জলে ভেসে থাকার চমৎকার এক স্বাভাবিক প্রবণতা। যে-কোন সাঁতারুই জানেন, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জলে ভেসে থাকা কতো সমস্যাসংকুল। সামুদ্রিক প্রাণীরা এই অসুবিধাটুকু অতিক্রম করে, হয় সাঁতার দিয়ে, না হয় উদাসীনভাবে জলে ভেসে থেকে। জলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের সর্বাঙ্গিক

ঘনত্বের পরিমাপ আয়ত্ত করার ক্ষমতা—যা' প্রত্যেক মাছেরই থাকে। সব র‍্যাট্‌-টেল্‌ মাছই খুব উন্নত ধরনের ডানার সাহায্যে তিন হাজার থেকে পঁচিশ হাজার ফিট্‌ জলের স্তরে স্বাভাবিকভাবে ভেসে থাকার অভ্যাস করে। মাছের দেহের অভ্যন্তরভাগে গ্যাস-পূর্ণ থলের মতো একটি থলি থাকে। এই সাঁতারের থলি সমুদ্র তলদেশের উপরিভাগে তাদের ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করতে বা ভেসে থাকতে সমর্থ করে। ঠিক যেমন গ্যাস-পূর্ণ বেলুন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তবে এর একমাত্র ব্যবহার এটাই নয়। এটা চাপসংজ্ঞাবহ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। যা' স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের সর্বাঙ্গিক ঘনত্বের পরিমাপ পরিবর্তন করে গভীরতার পরিবর্তনের ভিতর নিয়ন্ত্রিত হয়। হয়তো বা বাইরে থেকে গ্যাস নিয়ে, নয়তো থলি থেকে গ্যাস ছেড়ে দিয়ে। ঠিক উদ্‌গার করে দম ছাড়ার মতোই। আর এটি জল-কম্পন খুঁজে বার করার ভাল যন্ত্রও বটে। খাদ্যের অবস্থান নির্দেশ করার পথ র‍্যাট্‌-টেল্‌-এর এই সাঁতারের থলি সহজতর করে দেয়।

গাল্‌পারস্‌

গাল্‌পারস্‌ (Gulpers) হল স্যাক্কোফ্যারিংক্স্‌, ইউরিফ্যারিংক্স্‌ এবং ম্যাক্‌রোফ্যারিংক্স্‌-এর (Saccopharynx, Eurypharynx and Macropharynx) মতোই মনমুগ্ধকর দেহধারী মৎস্য জাতীয় প্রাণীকুল। এদের লম্বা, পাতলা, চাবুকের মতো কালদেহ। যা' দেখতে রশ্মিবিকিরণকারী জলের আলোড়নের মতো। এই রোগা চেহারাটাই হল ভ্রান্তিকর। কারণ, তারের মতো নমনীয় কিন্তু শক্তদেহী এই প্রাণীগুলির একটি উল্লেখযোগ্য পাকস্থলী থাকে, যা

বেলুনের মতো বেড়ে ফুলে উঠতে পারে, আর নিজেদের বড় বড় ফোলানো দেহের মতোই সব খাদ্য গলাধঃকরণ করতে সমর্থ। যে কারণে এদের নাম দেওয়া হয়েছে গালপার। আর এই কর্মের জন্যই স্বাভাবিকভাবে তাদের মুখগহ্বরটিও বিরাট হয়। দর্শনীয় আকৃতিগুলির মধ্যে এটিও একটি। যখন অসংখ্য ভোজ্য জিনিষ সামনে এসে যায়, তাদের চিন্তা করতে হয় না, কোনটা খাব, আর কোনটা ছাড়ব। অতএব, এরা ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাঁ করেই থাকে, যতক্ষণ না তার সব খাদ্য, যত বড়ই হোক না কেন, পুরোপুরি গলাধঃকরণ হয়।

ভবিষ্যতের খনিক্ষেত্র

সমুদ্রের মাটিতে অপচিত হওয়া বস্তুর সরবরাহকে সংযোজন করতে অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির জন্য মানুষের ক্ষিপ্তপ্রায় অনুসন্ধানকার্য মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে সমুদ্রে। পৃথিবীর জলভাগ সম্বন্ধে গবেষণা, ইহার মানচিত্রাংকন্ এবং গভীরতা নির্ণায়ক একদল বিজ্ঞানী—ভূতাত্ত্বিক এবং বিজ্ঞানীদলের এক দুর্লভ গোষ্ঠী—যাঁরা মহাসমুদ্রের তলদেশ পরিমাপ করার জন্য জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন; তাঁরা এক বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন—গভীর মহাসমুদ্রের তল-দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর কাদামাটির ভিতরে বেশ বড় আয়তন-বিশিষ্ট সব পিণ্ড অথবা স্ফীতি যা' দুষ্প্রাপ্য উপাদানে উদারভাবে ঠাসা অথবা পরিপূর্ণ।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনকারী এইসব বস্তুর নাম দেওয়া হয়েছে—'ডীপ্ সি নডিউল্‌স্' অর্থাৎ গভীর সমুদ্রের

পিণ্ডদল অথবা স্ফীতিসমূহ। সমুদ্রের যে বিস্তীর্ণ তলদেশের অংশে এগুলি ঢাকা থাকে, সেগুলিকে দেখলে মনে হয় যেন মসৃণ ও নরম জমির উপরে টন্ টন্ আলু ছড়ানো আছে। এটা হল কতকগুলি জিনিসের প্রাকৃতিক ধনাগার। যেগুলি হল,—ম্যাংগানীজ অর্থাৎ এক জাতীয় ধাতব পদার্থের উপাদান; লোহা; সীসা; তামা; নিকেল, অর্থাৎ সাদা উজ্জ্বল এক ধাতব পদার্থের উপাদান; কোবাল্ট, অর্থাৎ রূপার মতো শ্বেতবর্ণের একরকম ধাতু, প্রায় নিকেলের মতোই, যার থেকে রঞ্জক পদার্থ বার করা হয়; আর মলিব্‌ডেনাম্, অর্থাৎ রূপোর মতো সাদা এক ভঙ্গুর ধাতব উপাদান—যা' খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, উচ্চগতিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি তৈরীর প্রয়োজনে যে ইস্পাৎ লাগে—তাকে গলানোর সময়ে। এগুলি এত বিরাট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, যা' একজন মানুষকে জীবনভোর সরবরাহ করে যেতে পারে।

বাইরে থেকে এইসব 'ডীপ্ সি নডিউল্‌স্'কে দেখতে আকার ও মাপে আলুর মতোই অসমাঙ্গ। আর ভিতরে ডাচ্ অর্থাৎ ওলন্দাজ বাঁধাকপির মতোই শক্তভাবে ঠাসা। এই কপির হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ অন্তরতম প্রদেশ—তিমি মাছের কানের হাড় বা মাছের দাঁতের পাথুরে টুকরো, অথবা পলিমাটিপূর্ণ ধাতব পদার্থের যে কোনটি হতে পারে। মূল্যবান উপাদানগুলি শক্তভাবে ঠাসা বাঁধাকপির পাতার মতোই এদের অন্তরতম প্রদেশে নিজেদের স্তরীভূত করে। এই-ভাবেই ভবিষ্যতের খনিক্ষেত্রের সূত্রপাত হয়।

সি আরচিন্‌স্ এবং স্টারফিশেস্

সি আরচিন্‌স্ (Sea Urchins) অর্থাৎ সমুদ্রের শজারু এবং স্টার ফিশ্ (Starfish) অর্থাৎ তারা মাছ—সবই স্বতন্ত্রভাবে সামুদ্রিক প্রাণীর দলভুক্ত। এদের বলা হয় একিনোডারমাটা (Echinodermata)। এদের মৌলিক গঠন একই রকমের। দেহের মাঝখানে গোলাকার থালার মতো চাকতি—যাতে কমপক্ষে পাঁচটি বাহু স্পষ্টভাবে সংযুক্ত। তফাৎটা হল যে, তারা মাছের



সি আরচিন্‌স্ এবং স্টারফিশেস্

বাহুগুলি মুক্ত ; এবং সমুদ্র-শজারুর বাহুগুলি একত্রিত হয়ে একটি বলের আকারে অবস্থান করে। আকারে এই তফাৎটুকুর একটা

আরোপিত প্রভাব আছে। যা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এদের ভোজন-অভ্যাসের ওপর সেটি প্রভাবিত।

গুল্ম-লতা, চারা গাছপালা, এবং যেসব প্রাণীরা পাথুরে স্তরের উপর থেঁতলে যায়, বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, সেইগুলি খায় সমুদ্র-শজারু। তারা প্রথমে তাদের নল-পা দিয়ে পাথর আঁকড়ে ধরে। তারপর তাদের পাঁচটি লম্বা দাঁত দিয়ে খাদ্য ছাড়িয়ে খেতে শুরু করে। দেখলে মনে হয়, মোমবাতির আকারে যেন কতকগুলি বিজড়িত কংকাল সন্নিবেশিত হয়ে আছে। য়্যারিস্টটলের নামে এদের নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, প্রথমে তিনিই এই প্রাণীটির বর্ণনা দিয়েছিলেন। এই মোমবাতির মতো পেশীগুলি ফুলিয়ে সবেগে দাঁতগুলিকে নামিয়ে আনে নিচের দিকে। যাতে সবগুলি দাঁতই একত্রে মুখের নিচে চলে আসে। তারপর খাদ্যগুলিকে টুকরো টুকরো করে কেটে নেয়। তারপর সেই গোলাকার খাদ্যগুলি যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুখের মধ্যে চলে আসে। এই কাটা-ছেঁড়া ও কোদালের কাজ চলে অবিরাম। যার ফলে, আশ্চর্যজনকভাবে অতি অল্প সময়ে বিরাট অঞ্চল জুড়ে পাথরের স্তরগুলিকে সমুদ্র-সজারু সাফা করে তোলে।

স্টার ফিশ্ কিন্তু সমুদ্র-শজারুর মতো খাবার মুখে তুলে নেয় না। এরা নল-পা দিয়েই ছোট ছোট শীকার ধরে, আর তাদের নল-পায়ের সাহায্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দীর্ঘতা অতিক্রম করে, অর্থাৎ পায়ে পায়ে সম্পূর্ণভাবে এনে মুখে খাবার তুলে নেয়। তবে সাধারণতঃ তারা-মাছ ছোট শীকার দেখে থামে না। কারণ, এরা নিজেদের মতো বৃহত্তর প্রাণীদের ভোজন ক'রে পুষ্টিলাভ করতে সমর্থ। পাকস্থলীটাকে এরা ফুলিয়ে উপরে তুলে দেয়। তারপর প্রসারিত

করে শীকারের উপর। প্রায় তৎক্ষণাৎ গ্রাস ক'রে অদ্ভুতভাবে হজম করে ফেলে। তুই খোলাযুক্ত ঝিনুক বা খোলাযুক্ত মাছের মতো নিজেদের দেহটাকে তাদের তুটি খোলার উপর কুঁজের মতো ফুলিয়ে রাখে। তারপর বহু উদ্দেশ্যসাধক নল-পা দিয়ে খোলাগুলো টেনে ভাগ করে ফেলে। তুটি খোলার মধ্যে যখনই বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়, তখনই তারা-মাছেরা তাদের পাকস্থলীর দেওয়াল প্রসারিত করে দেয়। তারপর জোয়ারের মতো ফুলিয়ে ঢেকে ফেলে শীকারের নরম-দেহগুলি। প্রথমে বিষ প্রয়োগ করে, তারপর সব হজম করে ফেলে। এই অদ্ভুত স্বভাবের জন্য তারা-মাছ—ঝিনুক বা শুক্তির উৎপাদন স্থানে প্রধান ধ্বংসাত্মক প্রাণী হিসাবে নাম কিনেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এই সব তারা-মাছেরা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী অর্থাৎ সমুদ্র-শজারুদের আক্রমণ করে, যদিও তারা বাইরে থেকে সুরক্ষিত। ইচ্ছা করে এইসব হতভাগ্য প্রাণীগুলোর পাকস্থলী গলার কাছে টেনে নামিয়ে আনতে বাধ্য করে। যদিও এদের পাঁচ-পাঁচটি ধারালো দাঁত আছে, তাতে কিন্তু ওরা এতটুকুও ভয় পায় না।

জলশক্তি সম্পন্ন পা

এই জলশক্তিসম্পন্ন পা—যা' দিয়ে অসমতল জমিতেও মসৃণভাবে ঘোরাফেরা করা যায়। কিভাবে এই তারা-মাছ চলে, তা বুঝতে হলে একটা পোশাকের দোকানের ছবি মনে এঁকে নিতে হবে। যেখানে একটা কেন্দ্রীয় দণ্ড থেকে পাঁচটি, অথবা তার বেশীও হতে পারে, রড্ লাগানো আছে, যেগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এখন কল্পনা করা যেতে পারে যে, একটা চক্রনাভি সমন্বিত রড্ থেকে সারি সারি পাজামা ঝুলছে। তাদের পায়াগুলো থেমে থেমে নিচের দিকে ঝুলছে। প্রত্যেক পাজামার শেষের দিকে একটা শোষক-নল লাগানো যাক। এইবার দেখা যাবে যে, বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত তারা-মাছের নল-পা-এর গঠন ঠিক এই রকমই পাজামার সারির মতোই তারা-মাছের আলো বিকিরণকারী প্রত্যেক অঙ্গেই দু'সারি পা আছে। দেহের আভ্যন্তরীণ তরল পদার্থবাহী নালীর জটিল গঠনতন্ত্র থেকে এই নল-পায়ের উৎপত্তি। যেগুলি জলে পরিপূর্ণ থাকে। আর শক্তির কেন্দ্রীয় আধার গঠন করে। এবং যা' তারা-মাছের গতিবিধিকে শক্তিসম্পন্ন করে। যখন এই নল-পা-এর চলার প্রয়োজন হয়, তখনই ভিতরের নালী বা জলাধার থেকে জল পাম্প করে নল-পা-এর নলে নিয়ে আসা হয়। আর তৎক্ষণাৎ তারা ফুলে উঠে ভিতরের খাঁজ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রাণীটি যখন স্থিরাবস্থায় থাকা পছন্দ করে, তখনই নালীতে জল ফিরে যায়। আর নল-পাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুটিয়ে যায়। এই যান্ত্রিক পদ্ধতির কঠোর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যেই তারা-মাছ চলাফেরা করে। অথবা, সমুদ্রের তলার স্তরে মসৃণভাবে বিচরণ করে। ঠিক যেমন ভাসমান যান জলের স্তরে মসৃণভাবে ভেসে বেড়ায়।

এই চমৎকার পাগুলি, যা' অসমতল ভূমিতেও সুখকর ভ্রমণে সাহায্য করে, কেবলমাত্র যা' তারা-মাছেরই আছে—তা নয় কিন্তু। বেশ কয়েকটি অপর ভাগ্যবান প্রাণীরও এই রকম পা আছে। যেমন,—সি আরচিন্‌স্, অর্থাৎ সমুদ্র-শজারুর দল ; ব্রিট্‌ল্-স্টারস্,

অর্থাৎ পলকা তারকা ; সি কিউকামবারস্, অর্থাৎ সামুদ্রিক পাঁড়-শশা,—খাবার শশা নয় কিন্তু, দেখতে এদেরই মতো ; এবং সি ঘেরকিন্‌স্, অর্থাৎ সামুদ্রিক গেঁড়ি শশা।

এই নল-পা কেবলমাত্র পরিবহনের সুদক্ষ পদ্ধতি হিসাবেই নয়, হাতের কাজও চালিয়ে নেয়। শোষক-পা দিয়ে ছোট ছোট প্রাণীদের বন্দী করে তৎক্ষণাৎ দক্ষতার সঙ্গে মুখে চালান করে দেয় —ঠিক যন্ত্রের বহনকারী বেল্টের মতো। এই শ্রেণীর প্রাণীদের মুখগুলি দেখা যায় এদের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত। শীকারের উপর বদ্ধমুষ্ঠি এরা আলগা করতেও পারে আবার সুদৃঢ় করতেও পারে। এই চাপের পরিবর্তন করতে নলের জলের পরিমাপ ক্রমাগত পাম্প করে কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করে এরা। এটা উল্লেখযোগ্য যে, কেমন করে ভিতরের জল কয়েকটি স্থিতিস্থাপক বেলনাকার থলির মধ্যে পাম্প করে পাঠায়, যা' অসমতল ভূমির উপরে এক আদর্শ পরিবহন হতে পারে। আজ মানুষের এই ঘাটতি শক্তির যুগে পরিবহনের যান্ত্রিক পদ্ধতির উন্নতিকল্পে এই জলশক্তিসম্পন্ন পা একটা জবাবের সন্ধান দিতে পারে।

সি ঘেরকিন্‌স্

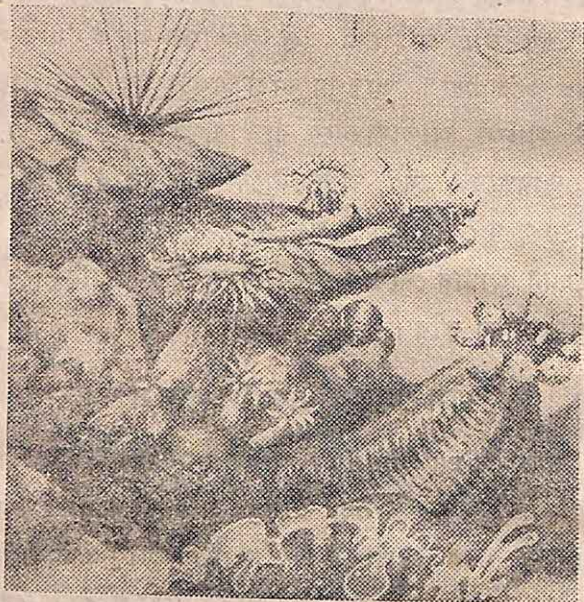
সি ঘেরকিন্‌স্ (Sea Gherkins) অর্থাৎ বাংলায় যাকে সামুদ্রিক গেঁড়িশশা বলা যেতে পারে—অবশ্য খাবার শশা নয়, শশার মতো দেখতে একজাতীয় প্রাণী। যাই হোক, এরা মানুষের মতোই খাওয়ার পরে আঙ্গুল চুষে চুষে তা' একেবারে সাফা করে ফেলতে পারে। দারুণ এক মনমুগ্ধকর ও অদ্ভুত খাওয়ার পদ্ধতি

এরা অভ্যাস করে। এদের মুখের চারপাশে স্পর্শানুভব করবার জন্য বা আঁকড়ে ধরবার জন্য আঙ্গুলের মতো দেখতে সরু ও নরম অঙ্গ আছে। যেগুলি আংটির মতো গোলাকার অঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত। এগুলিতে একরকম আঠালো বস্তু লাগানো থাকে, যার সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে এরা। তারপর ভারী একটা মজার ব্যাপার ঘটে। প্রত্যেকটি আঙ্গুল আলাদাভাবে বাঁকায়, আর মুখের মধ্যে প্রবেশ করায়। তারপরেই সেই আঙ্গুলটাকে বার করে নিয়ে আসে। খাদ্যটা নিয়ে মুখে পোরে না কিন্তু—শুধু লেহন করতে থাকে। ঠিক শিশুরা যেমন আচার খেয়ে আঙ্গুল চোষে, ঠিক তেমনিভাবে আঙ্গুল চোষে, আর সাফা করে।

সি স্নেল্‌স্‌ এবং সি স্লাগ্‌স্‌

সি স্নেল্‌স্‌ (Sea Snails) অর্থাৎ সামুদ্রিক শামুক বা গেঁড়ি-সমূহ এবং সি স্লাগ্‌স্‌ (Sea Slugs) অর্থাৎ সমুদ্রের খোলাহীন অথবা সামান্য খোলাযুক্ত শামুক জাতীয় প্রাণীকুল। এরা অধিকাংশই সমুদ্রের তীরে বাস করে। সব সময় জলের মধ্যে থাকাটা এরা পছন্দ করে না। কিন্তু বেশ কিছু আছে, যারা সমুদ্রে শান্তিতে বাস করে। এরা অগভীর জলের অঞ্চলটুকুতে মাটির উপরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। এদের কিন্তু কোন বাড়ীর সমস্যা নেই। আক্ষরিক অর্থে তারা নিজেদের বাড়ী নিজেরাই বহন করে। কিন্তু সমুদ্রের কিছু অভাগা খোলাহীন বা সামান্য খোলাযুক্ত শামুক জাতীয় প্রাণী আছে, যাদের জীবন খুব সহজ নয়। এদের সকলকেই গ্যাস্‌ট্রোপড্‌স্‌ (Gastropods) বলা হয়। অর্থাৎ চলাচলের জন্য এদের পা নেই।

পেটের উপরে ভর দিয়ে এরা চলে। অতএব, পেটকেই এদের পা বলা যায়।



সি স্নেল্‌স্ এবং সি স্লাগ্‌স্

যাই হোক, সামুদ্রিক শামুকের মজার দলটি হল—এরা স্তন্যপায়ী ও মাংসাশী। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, ঠিক যেমন সর্পিল খোলা-যুক্ত শামুক ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। এরা সব কঠোরভাবেই মৎস্য ও মাংসভোজী। এরা মৃতপ্রায় দ্বিপুটক প্রাণী অর্থাৎ দুই খোলাযুক্ত ঝিনুক বা খোলাযুক্ত মাছ খাওয়ারই বেশী পক্ষপাতী।

এরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য সর্বদা লালায়িত। সব সামুদ্রিক

শামুকেরই শূঁড় আছে। শূঁড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকে এদের মুখ। লম্বা নাকওয়ালা পশুর নাকের মতো নমনীয় শূঁড়—কতকটা হাতীর শূঁড়েরই মতো। এই অঙ্গের সাহায্যে তারা সরাসরি অনেকটা দূর থেকেও খাদ্যের উপরে মুখ লাগাতে পারে। মুখটা অনেকটা দূর অবধি পৌঁছতে পারে বলে খাদ্যের কখনও অপচয় হয় না। এক কামড় খাবারও ফেলা যায় না। কারণ, খাদ্য মুখে বাহিত হওয়ার পরিবর্তে মুখটাই খাদ্যের উপরে পরিবাহিত হয়। এইভাবেই ঝিনুকের অভ্যন্তর ভাগ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্পূর্ণরূপে সাফা হয়ে যায়। কারণ, মাংসের ভাগটুকু বেশ সযত্নে চাঁচা-ছোলা হয়ে শামুকের মুখে চলে যায়। অবশ্য বালির কাগজের মতোই কর্কশ ও সরু জিব আছে বলে। এই জিব র‍্যাডুলা (**Radula**) নামে পরিচিত।

এই রকম সমুদ্র-শামুকের সঙ্গে বিশেষ বৈষম্য হল, তাদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী সি-স্লাগস্ অর্থাৎ খোলাহীন বা সামান্য খোলাযুক্ত শামুকদের এবং অগভীর জলের সি লেমন্স্ (Sea Lemons) অর্থাৎ হলদে রঙের ডিম্বাকার কম্বোজ বা কোমলাঙ্গের শামুক, যারা পিঠে করে তাদের বাড়ী বয়ে বেড়ায় না। কিন্তু যদিও এরা গৃহহীন, তবুও এদের এক অদ্ভুত ধরনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা যে নেই, তা নয়। ঘটনাটা এই যে, এরা খেতে সম্পূর্ণরূপে স্বাদবিহীন। তাই শীকার-জীবীদের কাছে এদের কোন ভয় নেই। তাই তারা এদের শীকার করতেও শেখেনি। আর এই ভাগ্যবান প্রাণীদের স্বাদহীনতাই এদের রক্ষাকারী কবচ বা গৃহ, এবং প্রচুর নিরাপত্তাও বলা যেতে পারে। যদিও এরা করাতের মতো জিবযুক্ত শক্তিশালী সামুকদের সঙ্গে এক সাথেই বাস করে। যে শামুকেরা জলচর প্রাণীদের দেখতে পেলেই পেটুকের মতো গিলতে থাকে।

স্ক্যালপ্‌স্‌

স্ক্যালপ্‌স্‌ (Scallops) হল, অর্দ্ধ বৃত্তাকার খোলাযুক্ত দ্বিপুটক প্রাণীকুল। এদের গঠন হল গোলাকার। আর তাস-এর ইশ্‌কাপন্‌-এর মতোই একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়। যার কাণ্ডটি স্ক্যালপ্‌-এর খোলার জোড়-এর প্রতীক বলা যায়।

রাণী স্ক্যালপ্‌রা তাদের খোলা পত্‌পত্‌ করে রাজকীয়ভাবে জলের ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে যায়। এই পত্‌পত্‌কারী আন্দোলন জলকে খোলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে উৎসাহ দেয়। যেখান থেকে এই জল পিছন দিকে সবেগে নির্গত হয়। আর স্ক্যালপকে সামনের দিকে সজোরে চালিত করতে সক্রিয় ক'রে তোলে। এর পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ হল, ফোয়ারার জল যেমনভাবে উৎসারিত হয়ে থাকে।

রাণী স্ক্যালপ্‌দের আর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, বিপদের সময়ে তাদের প্রতিক্রিয়া। যখনই বিপদ সংকেত পায়, তখনই তারা সাঁতারের পুরো পদ্ধতিটাই পালটে ফেলে বিপরীত গতিতে চলতে সুরু করে। খোলার পরিবর্তে তখন খোলার জোড়-এর ঝাপটা দিতে থাকে, আর জল উৎসারিত হতে থাকে সামনের দিকে। রাণী স্ক্যালপ্‌রা তখন পিছনদিকে চালিত হতে থাকে, এবং বিপদের মুখ থেকে সবেগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এদের খোলা এবং খোলার জোড়-এর ঝাপটা নিয়ে বেচারা রাণী স্ক্যালপ্‌দের চালচলনে তখন সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত দেখায়। তাদের রাজকীয় মর্য্যাদার একটা অশোভন অবস্থা বলা যায়। সঠিক বর্ণনা

দিতে হলে বলতে হয়—একটি ডানায় সব কিছু। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না, যদি কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষা প্রকাশের এই ভঙ্গিটি 'স্ক্যালপ্ এবং তাদের বিপদে প্রতিক্রিয়া' থেকে উৎপত্তি হয়।

অয়স্টারস্

অয়স্টারস্ (Oysters) অর্থাৎ ঝিনুক হল, কোমলাঙ্গ সমন্বিত এক দ্বিপুটক অর্থাৎ খোলাযুক্ত প্রাণীকুল। প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন যে, আঠালো শিশির-ফোঁটা আকস্মিকভাবে খোলা ঝিনুকের মধ্যে পড়ে, বিদ্যুৎ অথবা প্রভাতের সূর্য-রশ্মির সাহায্যে তা' ঘনীভূত হয়ে নিখুঁত সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুক্তায় পরিণত হয়।

এইভাবে এটি লোককথায় পর্যবসিত হয়ে আছে। তবে একশো বছর আগে মানুষ যখন ইচ্ছাতাড়িত হয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তার চাষ সুরু করল, তখনই প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হল। ঝিনুকের কিছু সূক্ষ্ম কোষ যা অতিথি বরণে তীক্ষ্মভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, সেটি পরাশ্রয়ী কোন জীবাণু হোক, আর বালুকণাই হোক, মুক্তায় পরিণত করার পক্ষে পর্যাপ্তভাবে উদ্দীপিত বা সক্রিয়। এগুলোকে ঝেড়ে ফেলার পরিবর্তে ঠিক কেন যে এটা করে, সেটাই রহস্যময় হয়ে আছে। কিন্তু কেমন করে তারা এটা করে, তা সঠিক জানা যায়নি।

অবাঞ্ছিত বাইরের বস্তুকণা, যখন তাদের খোপের মধ্যে বন্দী হয়ে যায়, এবং নরম সূক্ষ্ম কোষে যেটি পৃথক অবস্থায় থাকে, তখন চারিদিকের দেওয়াল থেকে সঙ্গে সঙ্গে রস নিঃসৃত হয়। যাকে মুক্তা-মাতার শুক্তি-রস বলা হয়। নিয়মিতভাবে এই স্তর জমতে

থাকে। আর এই নিঃসৃত রস ক্রমে ক্রমে জমে গোলাকার রশ্মি-বিকিরণকারী মুক্তায় পরিণত হয়।

প্রায়ই এই সব বাইরের বস্তুকণা, খোলা এবং সূক্ষ্ম কোষের মধ্যে আটকে যায়, আর এইভাবেই মুক্তা-মাতার রসের আবরণ পড়তে থাকে। তখন গঠিত হতে থাকে মুক্তা। এই মুক্তাকে বলা হয় ফোস্‌কা মুক্তা। এই ফোস্‌কাগুলি সূক্ষ্ম রাজহাঁসের গলার মতো সংলগ্ন হয়ে থাকে এদের খোলায়, যেটি অনাড়ম্বরের সঙ্গে করাত দিয়ে কেটে কেটে পোষাকী গয়নার জন্য ব্যবহার করা হয়।

জাপানীদের সূচিত মুক্তাচাষের পদ্ধতি মুক্তা-শিল্পে উল্লেখযোগ্য-ভাবে সবলে পথ করে নিয়েছে। এই সুপরিচিত চাষ করা মুক্তাদল কিন্তু কৃত্রিম নয়। এগুলো ঝিনুকের উৎপাদিত খাঁটি মুক্তা। পার্থক্য হল এই যে, বালুকণা অথবা পরাশ্রয়ী জীবাণু যা' ঝিনুকের রস নিঃসরণ করতে উদ্দীপ্ত করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে জাপানী কর্ষকেরা মুক্তা যাতে স্বয়ংগঠিত হতে পারে, সেই রকম পন্থা অবলম্বন করে। তারা ঝিনুকের সূক্ষ্ম কোষে তৈরী একটি থলিতে মুক্তা-মাতার গুটিকা প্রবেশ করিয়ে দেয়, তারপর সেটিকে একটি জীবন্ত ঝিনুকের মধ্যে স্থাপন করে, আর সেই ঝিনুককে সমুদ্রে শুইয়ে রাখা হয় বেশ কয়েক বছর। তখন এই গুটিকার চারপাশে ঝিনুক খাঁটি মুক্তা গঠন করতে থাকে। পরে সাধারণ পন্থায় এটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। আজ জাপানে বিস্ময়করভাবে দেড় কোটি ঝিনুকের কর্ষণ হচ্ছে।

কর‍্যাল্‌স্

কর‍্যাল্‌স্ (Corals) অর্থাৎ প্রবাল হল, এক জাতীয় সামুদ্রিক কীটসমূহ। সমুদ্র থেকে জলমগ্ন বা পতিত জমি পুনরুদ্ধারের প্রাকৃতিক উপায় হল, প্রবাল-প্রাচীর গঠন করা। সব প্রবাল-প্রাচীরের গঠনাকৃতি সমান। এদের বলা হয়—মাদ্রেপোরারিয়া (Madreporaria) অর্থাৎ ছিদ্র সমন্বিত প্রবালবর্গ। প্রবাল-প্রাচীরের একেবারে বাইরের অংশ বা ধারগুলি হল সজীব, অর্থাৎ জীবন্ত প্রবাল-কীটের পাতলা স্তরে আচ্ছাদিত। অপরিণত দেহযন্ত্রবিশিষ্ট প্রাণী হিসাবে এরা পরিচিত। যারা বিভিন্ন ও অগণ্য বর্ণ নিয়ে বেরিয়ে আসে। যেমন, বাদামী বা ভেলভেট, ফিকে লাল, সাদা, কমলা, সবুজ অথবা হলুদ রঙ প্রভৃতি। অপরিণত দেহযন্ত্রবিশিষ্ট এই সব প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, সমুদ্রের জল থেকে ক্যাল্‌সিয়াম্ কারবনেট্ অর্থাৎ চুণ-অঙ্গারাম্ল সরিয়ে ফেলে খড়িময় কংকাল তৈরী করা। অর্থাৎ প্রবাল-প্রাচীরের শেষাংশ বা আভ্যন্তরীণ অংশ হল, মৃতপ্রাণীদের অবশিষ্ট খড়িময় কংকালের অংশ।

দুটি সাধারণ ধরনের প্রবাল-প্রাচীর-এর একটি হল, অ্যাটল্‌স্ (Atolls) অর্থাৎ উপহ্রদ বেষ্টনকারী বলয়াকার প্রবাল-প্রাচীর ; এবং অপরটি হল, বেরিয়ার রীফ্‌স্ (Barrier Reefs) অর্থাৎ প্রতিবন্ধক প্রবাল-প্রাচীর। অ্যাটল্‌গুলো বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে মধ্য-মহাসাগরে গঠিত হয়। প্রধান ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে। চেহারায় আংটি-আকৃতি এই প্রবাল-প্রাচীরগুলি অগভীর উপহ্রদকে হয় পরিবেষ্টন ক'রে থাকে, নয়তো অবরুদ্ধ ক'রে থাকে। আর এর

চতুর্দ্দিক গভীর জলে পরিবেষ্টিত থাকে। কখনও কখনও এই প্রবাল-প্রাচীরগুলি সমুদ্র থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত হয়ে পাতলাভাবে বিক্ষিপ্ত গাছপালা অবলম্বন ক'রে থাকে।

অ্যাটল্-এর মতো বেরিয়ার রীফও গভীর জলে দেখা যায়। তবে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নরকম দেখতে। তারা মধ্য-মহাসাগরে ফিতের মতো বা চেনের মতো ডুবন্ত দেওয়াল গঠন করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রবাল-প্রাচীর হল, অস্ট্রেলিয়ার 'দি গ্রেট্ বেরিয়ার রীফ্'। এটি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলবর্তী সমুদ্রবরাবর মহাদেশীয় বালুচরের উপরেই অবস্থিত। আর এটি নিউ-গিনির উপকূল ধরে চলে গেছে। বহুরকমভাবে গঠিত এই প্রবাল-প্রাচীর এক বিশাল চেন সৃষ্টি ক'রে এক হাজার দুশো ষাট মাইল ব্যাপী বিস্তারিত। এবং এক লক্ষ বর্গমাইল অঞ্চল পরিবেষ্টন ক'রে আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যে গভীরতা অবধি এটা চলে গেছে, সেটি পাঁচশো ফিটের বেশী কখনও হয় না।

এই প্রবাল-প্রাচীর ছিদ্র সমন্বিত প্রবালবর্গ বা প্রবাল-কীট দিয়ে গঠিত হয়। এরা হল 'সি অ্যানিমোন্ (Sea Anemone) অর্থাৎ বায়ু-পরাগী পুষ্পের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন। এরা কিন্তু ঠিক বায়ু-পরাগী পুষ্পের মতো নয়। এরা কাপের মতো একটা খড়িময় অস্থি লুকিয়ে রাখে, যার ভিতরে এরা বসে থাকে ; এবং যখন সতর্ক-বার্তা পায়, তখন সম্পূর্ণরূপে এর মধ্যে নিজেদের সরিয়ে নেয়। যখন এই অপরিণত দেহযন্ত্রবিশিষ্ট প্রাণীটি মারা যায়, এর কংকালটি থেকে যায়, এর উপরে আর একটি দেহ জন্ম নেয়। হাজার হাজার বছর ধরে এই কংকালগুলি দিয়ে গঠিত হয়েছে—'দি গ্রেট্ বেরিয়ার

রীফ্'। একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহ পরস্পরভাবে সম্মিলিত হয়ে আছে এদের মাথার উপরে। যেমনভাবে মিলিত হয়ে আছে বহুবর্ণের সামুদ্রিক্ শশা, উজ্জ্বল বর্ণের মাছ, বৃহদাকার নলকীট—যাদের স্পর্শ অনুভব করার এবং আঁকড়ে ধরার জন্য সরু ও নরম অঙ্গ আছে, আর চমৎকার বর্ণচ্ছটাযুক্ত শিরোভূষণ আছে, বড় বড় ফুলের মতো সমুদ্রের বায়ু-পরাগী পুষ্প, অসংখ্য কাঁকড়া, সব রকমের খোলাযুক্ত প্রাণী—যেমন, সামুদ্রিক জটাযুক্ত বহুভূজী চ্যাপটা প্রবাল এবং স্পঞ্জ। এগুলি সবই প্রবাল-প্রাচীরকে সমুদ্র-বাগিচায় পরিণত করতে সাহায্য করে। যা' খুব কম চোখই দর্শনলাভ করতে সক্ষম হয়।

স্পঞ্জ

স্পঞ্জ (Sponge) দেখতে যদিও চারাগাছের মতো, এরা প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এক ধরনের প্রাণীকুল। সত্যিই এদের দেখলে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। যদি কোন স্পঞ্জ কোন ঝাঁঝরির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে যায়, এরা নিজেরাই ভদ্রভাবে স্বতন্ত্র কোষ-এ বিভক্ত হয়ে যায় নিজেদের ছেঁকে নেওয়ার জন্য। তারপর আবার এরা মিলিত হয়ে নতুন একটি স্পঞ্জ-এ পরিণত হয়। মহাসমুদ্রের গভীরতা থেকে আমাদের স্নানের গামলায় এরা চলে আসে।

সবচেয়ে ভালজাতের স্পঞ্জ হল—হনিকুম্ব অর্থাৎ মৌচাক, জিমোক্কা এবং টারকি-কাপ অর্থাৎ তুরস্ক-পেয়ালা প্রভৃতি। এগুলির সবচেয়ে নরম বুনন। মিশরের জলভাগে প্রায় দুশো ফিট্ গভীরে

এদের পাওয়া যায়। দক্ষ ডুবুরিরা তিরিশ পাউণ্ড-এর পাথরের চাঁই-এর সঙ্গে নিজেদের বেঁধে এই গভীরতায় ত্বরিৎ নেমে গিয়ে দুই থেকে চার মিনিট অবধি জলের মধ্যে অবস্থান ক'রে এই স্পঞ্জ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে। পূর্ব ব্যবস্থাকৃত সংকেত পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন রক্ষাকারী দড়িটা সবলে টেনে তাদের উপরে তোলা হয়। যে দড়িটা ডুবুরীদের বগলে গলানো চামড়া বা রবারের চাকার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। আর পাথরের চাঁই-এর সঙ্গে বাঁধা অপর দড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে টেনে উপরে তোলা হয়।

প্রাকৃতিক স্পঞ্জ-এর থেকে আজকাল কৃত্রিম প্লাসটিকের স্পঞ্জ-এর চাহিদা বেশী। বিশেষ করে গৃহস্থালী সংক্রান্ত জিনিসপত্র সাফার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃত আরামপ্রদ স্নানের জন্য প্রাকৃতিক জিনিসের মতো কিছুই নেই।

পালোলো

পালোলো (Palolo) হল, এক ধরনের জলজ কীট। যাদের দেখা যায় গ্রীষ্মমণ্ডলের সাগরগুলিতে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত সামোয়া'র কাছে এদের দেখা যায়। যুক্তিযুক্তভাবেই এদের উপনাম দেওয়া হয়েছে—'সি ক্যালেণ্ডার'। সারা বছর এরা পাহাড়ের ফাটল এবং গর্তের মধ্যে বাস করে। আর প্রবাল-কীট জন্মায় সমুদ্রের তলদেশে। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক বছরে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকটি পালোলো কীট বেরিয়ে এসে সমুদ্রের উপরের স্তরে ভাসতে থাকে। সুবিশাল ঝাঁকের একটি অংশ

ওদের বাৎসরিক নৃত্য সুরু করে। ঠিক যেন পালোলোদের বিবাহ নৃত্য।

প্রত্যেক বছরের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে ঘড়ির কাঁটার মতো এরা নিয়মিত। চাঁদ যখন তার শেষের চারটি দিনে অবস্থান করে, তার ঠিক একদিন আগে প্রত্যূষের প্রথম আলোয় মহাসাগরের উপরের স্তরে তাদের বিবাহ-নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যায়। জলের উপরে তারা চলমান ঘন কার্পেটের সৃষ্টি করে। এই বিবাহ-নৃত্য কি এবং কেন? সমুদ্র-সংক্রান্ত শরীরতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন যে, এদের ঝাঁকে ঝাঁকে ডিম ছাড়া বা ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম দেওয়ার এক পদ্ধতি বিশেষ। অবশ্য এটা সচরাচর ঘটে না। কারণ, প্রত্যেক কীটের অর্দ্ধেক মাত্র জনন-ইন্দ্রিয় বহন করে থাকে— একেবারে পিছন দিকে।

সেই বিরাট দিনটির প্রভাতকালে তারা দেহের চালক অংশ উল্টো করে বিপরীতমুখী হয়ে তাদের আত্মগোপনের আশ্রয় থেকে অগ্রসর হতে থাকে। যখনই তাদের পিছনের অর্দ্ধেক অংশ বাইরের দিকে সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হয়, এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে মোচড় দিয়ে দিয়ে জলের উপরের স্তরে চলে আসে, সূর্য ওঠার অন্ততঃ দু'ঘণ্টা আগে। এদের মাথার দিকটা গুটিয়ে এদের গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই উত্তেজিত অর্দ্ধদেহী কীটগুলিতে সমুদ্র পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর সূর্যের প্রথম রশ্মি যখন জলের উপর পতিত হয়, তারা ডিম ছাড়তে সুরু করে। চারিদিকের জল একেবারে বিবর্ণ করে তোলে। সূর্য উঠে যাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যেই যাদুমন্ত্রের মতো তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের আর কোন চিহ্নই থাকে না।

কারণ, তাদের মৃতপ্রায় পিছনের অংশটি তখন তলদেশে তলিয়ে যেতে থাকে। আর অপেক্ষমান মৎস্যদের দ্বারা মহাসমারোহে ভক্ষিত হতে থাকে।

অবশ্য পালোলো কীটকুল কেন যে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনটিকে তাদের বিবাহনৃত্য উৎসবের দিন বলে বেছে নিয়েছে, তার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে কিন্তু চাঁদের অন্যান্য আরোপিত প্রভাব জীবন্ত কীট-পতঙ্গ, এমন কি, মনুষ্যকুলের উপরেও কেন যে পড়ে— সেটাই বেশ একটু রহস্যময় ব্যাপার।

অক্টোপাস

অক্টোপাস (Octopus) হল এমন একটি সামুদ্রিক প্রাণী, যাকে জয় করা যায় না। যার চলনভঙ্গি রোলারের মতো গড়ানে, হাতীর মতো দেখতে, আর আটটি পা আছে। এরা সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করে। এগুলি হল, অক্টোপাস-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যখন আবার জলের মধ্যে ঝুলন্ত বা ভাসমান অবস্থায় থাকে, বা চলে ; তখন মনে হয়, ব্যালে-নর্তকীর সাবলীল ভঙ্গিমা ও সৌন্দর্য্য নিয়েই তারা চলছে। তাদের দেহান্তর্গত আটটি শক্তিশালী অঙ্গ নিয়ে চলছে বলে বিস্ময়কর লাগে না কিন্তু। লোকবিশ্বাসের প্রতিকূলে বলা যায় যে, এরা কিন্তু কাছাকাছি কোথাও থাকে না। যতক্ষণ না নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। তখনই এদের সদলবলে অনেক-গুলিকে এক সঙ্গে দেখা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, অক্টোপাসদের এই রকম নমনীয় আটটি শক্তিশালী পা হল ব্যতিক্রম।

এরা অত্যন্ত চতুর প্রাণী। ঠিক যেন নিরপেক্ষ ও নিশ্চল শিকারী। এদের দেহের নরম অঙ্গগুলো বাইরে পেতে রেখে শরীরটাকে গুটিয়ে পাহাড়ের ফাটলে প্রবেশ করিয়ে রাখে। একবার কোনরকমে দেহটাকে এই ফাটলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তারা কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী—যেমন, কাঁকড়া, গলদা চিংড়ী ইত্যাদির জন্য এবং সন্দেহবিহীন মৎস্যের জন্যও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। বিশেষ করে ভাসমান কাঁকড়ার জন্য।



অক্টোপাস

যখনই তারা বেশ সুস্বাদু কাঁকড়া দেখতে পায়, গোপনীয় ফাটল থেকে সবেগে বেরিয়ে এসে তাদের স্থূলশীর্ষ পেরেকের মতো

শক্ত অথচ নমনীয় চোষক অঙ্গ দিয়ে আক্রমণ করে সতর্কতার সঙ্গে, পিছন দিক দিয়ে। আর লক্ষ্য রাখে এর খাবার উপরে। যখনই এর খাবাকে তাদের ডানা দিয়ে অসহায় করে ফেলে, তখন তাদের তোতা পাখীর ঠোঁটের মতো চোয়াল দিয়ে কামড়াতে থাকে, আর একই সঙ্গে বিষ ঢালতে থাকে। তারপর কাঁকড়াটি মারা যায়।

অক্টোপাসদের অলস-আখ্যা আছে ঠিক কথা, কিন্তু দৈহিক শক্তির সাহায্যে কাঁকড়ার খোলা থেকে মাংস তুলে খাওয়া, এমন কি মাংস তোলার চেষ্টাটাকেও তারা ঘৃণাবোধ করে। এর পরিবর্তে এরা মাংস তোলার জন্য দক্ষতার সঙ্গে একটা পথ উদ্ভাবন করেছে।

তারা সহজভাবেই তাদের পাকস্থলী থেকে পাচক-রস নির্গত ক'রে কাঁকড়ার খোলায় ঢেলে দেয়। ফলে, মাংসটা গলে যায়। আর হজমের কাজও কিছুটা এগিয়ে যায়। তখন তাদের চোষক-অঙ্গের সাহায্যে চুষে নিয়ে সেই বলবর্দ্ধক মাংসের ঝোল মুখে পুরে দেয়। যেন সুদক্ষভাবে স্ট্র-পাইপ লাগিয়ে অর্থাৎ খড়ের নলের সাহায্যে ঝোল পান করছে। এইভাবে কাঁকড়ার খোলার আদ্যপ্রান্ত পরিষ্কার করে ফেলে, তাদের ছেড়ে দেওয়ার আগে। আক্ষরিকভাবে বলা যায়—চেঁচে-মুছে সাফা করা।

তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন স্কুইড্‌স্ আর কাট্‌ল্‌ফিশ্-এর মতোই অক্টোপাসদের বৃহত্তর মস্তিষ্ক এবং অপরাপর মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো অতি উন্নত ধরনের চক্ষুদ্বয় আছে। বাস্তবিকপক্ষে, তাদের দৃষ্টিশক্তি মানুষদের মতোই সমান। ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের চেয়েও ভাল বলা যায়। এই শক্তিশালী দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অক্টোপাসদের নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া একটা

সমস্যাই নয়। তারা বাধ্য না হলে ভ্রমণ করা পছন্দ করে না। আর তারা যখন বাধ্য হয়, দলবদ্ধভাবে নিচে নেমে যায়, এবং তাদের মধ্যে প্রচুর ক্ষতি সাধন করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আদি বসবাস-কারীদের খাদ্যাভাব ঘটায়।

কাট্‌ল্‌ফিশ্‌

কাট্‌ল্‌ফিশ্‌ (Cuttlefish) হল, এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী। কতকটা কচ্ছপের মতো দেখতে। এদের ধাওয়া করলে এক প্রকার মসীবর্ণ তরল পদার্থ নিঃসরণ করতে করতে পালাতে থাকে। এদের ভিতরের খোলাটা পালিশ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। স্পর্শানুভব করা এবং আঁকড়ে ধরার উপযোগী সরু ও নরম অঙ্গও আছে। এদের সামুদ্রিক মৎস্যও বলা হয়। সমুদ্র হল এদের শ্রেষ্ঠ বাজার।

কোন অসতর্ক মাছ বা কাঁকড়া যদি শুদ্ধ বাতাস গ্রহণের জন্য উপরে আসে, তারা সাপের মতোই এদের সরু ও নরম অঙ্গটি দিয়ে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। অঙ্গের সঙ্গে একটি চোষকাঙ্গও থাকে। যখন এই অঙ্গ সজাগ হয়, এবং তারা শয়তানের দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করে, তখন বুঝতে হবে যে, তারা খুবই ক্ষুধার্ত। বালির ভিতরে এই চতুর কাট্‌ল্‌রা সতর্কভাবে লুকিয়ে থাকে, এবং ধৈর্য-সহকারে খাদ্যের জন্য অপেক্ষা করে।

নিশ্চয় এরা চতুর। কেননা, যখন কোন কাঁকড়ার দিকে এরা অগ্রসর হয়, এরা সদা সতর্ক থাকে এবং পিছন থেকে এরা আক্রমণ করে। সাহসিকতার অপেক্ষাকৃত ভাল অংশ হল, বিচক্ষণতা—এই

বিচার করেই তারা আক্রমণে উদ্যত হয়। এদের চোষক-অঙ্গ দিয়ে কাঁকড়ার থাবাগুলো দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে, এবং নিজেদের দেহ থেকে বেশ কিছুটা দূরে ধরে থাকে।

তারপর শক্তিশালী তোতাপাখীর ঠোঁটের মতো চোয়াল এবং ছোট উঁখোর মতো জিব—যা' তীক্ষ্নাগ্র দাঁত দিয়ে ঘেরা, এগুলির সাহায্য নিয়ে কাট্‌ল্‌রা অসহায় কাঁকড়াকে দংশন করতে আরম্ভ করে। আর একই সময়ে এদের জ্ঞাতি ভ্রাতা অক্টোপাসদের মতোই একই পদ্ধতির সাহায্যে মারাত্মক বিষ তাদের শরীরে প্রবেশ করাতে থাকে। তারপর শান্তিপূর্ণ আহার উপভোগের জন্য বিশ্রাম নেয়।

এতেও পেটুক কাট্‌ল্‌গুলো সন্তুষ্ট হয় না। হঠাৎ বাগদা চিংড়ী বা অন্যান্য সুস্বাদু খাবারের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। যেগুলি মাইলের পর মাইল বরাবর বালির মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রাখে তাদের গোপন জায়গায়। যা' সহজে খুঁজে বার করা খুবই শক্ত। কিন্তু তাদের শীকার করার জন্য নির্ভীক কাট্‌ল্‌দের সেই অব্যর্থ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়, যা' বোকারাও সহজে ধরে ফেলে।

তখন তারা করে কি, অবিরামভাবে জলের ফোয়ারা দিয়ে বালির উপর আঘাত করতে থাকে। এতে বালি সরে যায়, আর চিংড়ী-গুলোকে অনাবৃত করে ফেলে। কিন্তু তবুও নিঃশংক কাট্‌ল্‌দের পক্ষে তাদের দেখা পাওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। কারণ, তাদের গায়ের রঙ ঠিক বালির মতোই, যে বালির ভিতর তারা লুকিয়ে থাকে। তখন কাট্‌ল্‌গুলো তাদের নড়ন-চড়ন-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আর যখনই তারা নিজেদের ঢাকার জন্য দেহের উপর আরো বালি চড়াতে থাকে, তখনই কাট্‌ল্‌ফিশ্‌ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের

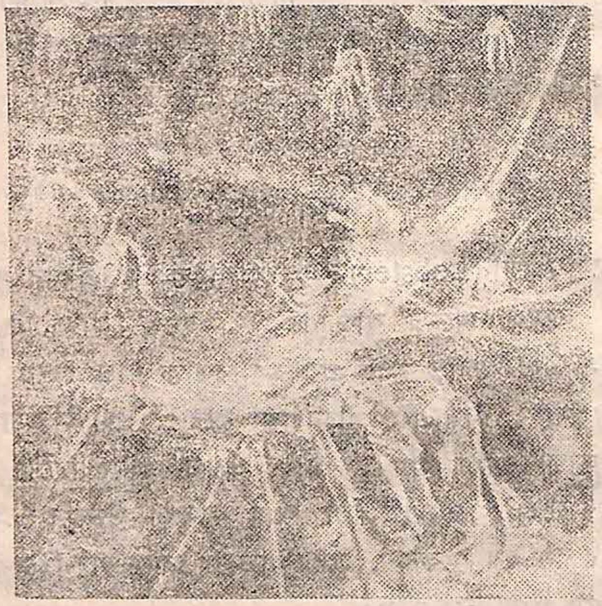
বিস্তারিত বাহু আর আঁকড়ে ধরার উপযোগী সরু ও নরম প্রসারিত শুঁড় দিয়ে একটি বাগদা চিংড়ীকে ধরে ফেলে। আরএক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে তাকে টেনে নেয় মুখে, যা নিরাপদভাবে অন্য কাট্‌ল্‌-এর হাত থেকে রক্ষা করে, যে হাত স্বচ্ছন্দে ফাঁদ-পাতা দরজার মতোই চলে আসে এর উপরে। তখন আর একটি ভোজন-পর্বের সময় উপস্থিত হয়।

গলদা চিংড়ী

গলদা চিংড়ী (Lobster) হল, খোলাযুক্ত এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য। এদের সমুদ্রের ঝাড়ুদার বলা হয়। কারণ, এরা জলজ গাছপালা এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর পরিত্যক্ত খাদ্য খেয়ে সমুদ্রের তলদেশ সাফা করে এবং জীবনধারণ করে। এরা কাঁকড়ার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলা যায়। আর এদের জীবনধারণের ভঙ্গিও কাঁকড়ার মতো। গলদা চিংড়ী আর কাঁকড়া উভয়কেই সমুদ্রের ঝাড়ুদার বলা হয়। কেননা, এদের খাওয়ার কোন বাদ-বিচার নেই। যা' দেখতে পায়, তাই খায়।

সাধারণ গলদা চিংড়ী থেকেও বৃহত্তর এবং বাদামী রঙের ভাস্কর্য সমন্বিত খোলা নিয়ে এরা আরো বেশী সুন্দর ; কিন্তু এদের তীক্ষ্ম ও বক্র নখর অপেক্ষাকৃত ছোট, ও এরা মেরুদণ্ডী গলদা। এদের নাম হল—রক্ লবস্টার বা ক্র ফিশ্‌ অর্থাৎ পাহাড়ী গলদা চিংড়ী বা ইংলিশ চ্যানেলের পরিষ্কার জলের মেরুদণ্ডী গলদা চিংড়ী। এই গলদা চিংড়ী ফরাসী দেশে এক উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য। সেখানে

এগুলো ল্যাংগাউস্ত (Langouste) নামে পরিচিত। অন্য প্রকারের মেরুদণ্ডী গলদা চিংড়ী দেখা যায় ভারতবর্ষে, নিউজিল্যাণ্ড-এ, অস্ট্রেলিয়ায়, সাউথ আফ্রিকায় ও ক্যালিফোরনিয়ায়।



গলদা চিংড়ী

আবার নরওয়ে গলদা চিংড়ী কিন্তু অধিকাংশ গলদা চিংড়ীর মতো দেখতে নয়। আর এরা থাকে সাধারণতঃ অগভীর জলে। তিনশো থেকে চারশো ফিট্ জলেতে এরা বাস করে। এদের দীর্ঘ ও সরু, তীক্ষ্ম ও বক্র নখর নিয়ে এক চমৎকার গঠন। যাতে সহজে বায়ু প্রবাহের ঝাপটা কাটিয়ে চলতে পারে, সেজন্য তরল পদার্থের

প্রবাহের মতো ক্রমশঃ সরু করে তৈরী হয়েছে এদের আকার। এদের কমলা রঙের দেহে লাল ও সাদা সরু সরু ডোরা কাটা, যা' কর্দমাক্ত গভীরতায় নিজেদের সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

ইশপ্ প্রন্স্

ইশপ্ প্রন্স্ (Aesop Prawns) অর্থাৎ এক জাতীয় বাগদা চিংড়ী। যাকে বলা হয় ইশপ্ বাগদা। এরা প্রথমে বর্ণহীন জীবন সুরু করে। প্রায় স্বচ্ছ বর্ণের বাচ্ছারা স্রোতের সঙ্গে ভেসে বেড়ায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারা ভেসে ভেসে উপকূলে চলে আসে। আর ভাসমান লতাপাতা বা আগাছা আঁকড়ে ধরে এবং এখানেই তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এদের সঙ্গে থাকাকালীন এদের রঙের সঙ্গে নিজেদের রঙ মেলাতে সুরু করে। এক সপ্তাহের মধ্যে এদের রঙ পরিবর্তিত হয়ে আগাছা বা লতাপাতার রঙের সঙ্গে হুবহু মিলেযায়। তখন অতি সন্নিকটে থেকে এদের পুংখানুপুংখভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তবেই চেনা যায়। তা না হলে, এরা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলা যায়।

যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এদের এই সব পছন্দসই ঘর-বাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়, তারা আবার নতুন ঘর-বাড়ীর সন্ধান করে। আবার সেখানে গিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তাদের রঙের সঙ্গে নিজেদের রঙ মিলিয়ে নেয়। এইজন্য এদের প্রতিভাসম্পন্ন ছদ্মবেশী শিল্পী বলা হয়। যদি তা' সম্ভব না হয়, তখন দর্শনশাস্ত্রানুযায়ী ভিন্ন বর্ণের বাড়ীতেই আশ্রয় নেয়, কিন্তু আবার নতুনভাবে নিজেদের রঙ করার পদ্ধতি অবলম্বন করে। একটি সপ্তাহ সরবে কেটে যাওয়ার পর

আবার তারা নতুন ঘর-বাড়ীর রঙের সঙ্গে সুন্দরভাবে নিজেদের রঙ মিলিয়ে ফেলে।

বাড়ীর রঙের সঙ্গে নিজেদের রঙ মিলিয়ে নেওয়া ছাড়াও ইশপ্ বাগদারা দিনের রঙের সঙ্গেও মিলিয়ে নেয় নিজেদের রঙ। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে তাদের রঙ বদল ক'রে তারা সুন্দর এক ঘন স্বচ্ছ নীল রঙ-এ পরিণত হয়। তাদের পূর্বেকার পছন্দসই ঘর-বাড়ীর রঙ তারা পিছনেই ফেলে আসে। সমুদ্র যেমন প্রতি প্রভাতেই উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, রাতের কালো বেশ ত্যাগ ক'রে।

তাহলে দেখা যাক, এইসব বিস্ময়কর ছদ্মবেশী ছানা-পোনাদের কি ক'রে আর কেমন ক'রে ইশপ্ বাগদারা তাদের ও নিজেদের চিত্রিত করে—খুবই মজার ব্যাপার। একটা বিশেষ রঙ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া বাগদা চিংড়ির পক্ষে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সারা দেহ ছোট ছোট রঞ্জক পদার্থের কোষে ছেয়ে আছে। প্রত্যেকটি রঙের একটি করে কেন্দ্রীয় থলি আছে, যেটি প্রাথমিক রঞ্জক পদার্থের ভাঁড়ার ঘর। প্রধান রঙগুলি হল,—লাল, হলদে এবং নীল। এখান থেকেই সব সূক্ষ্ম শাখা চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে।

এই রঞ্জক পদার্থের কোষগুলি আলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যা' সরাসরি তাদের উপরে পড়ে। অথবা, তাদের চোখের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে। বিভিন্ন রঙীন আলো এদের প্রাণীদেহজ রসকে কার্যকরী করে। অর্থাৎ যে-রস রক্তের সঙ্গে মিশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় ক'রে তোলে। আর রঞ্জক পদার্থের প্রবাহকেও

নিয়ন্ত্রিত করে। কখনও এর শাখাগুলির জটিল জালের কাজে বন্যা বয়ে যায়; আবার কখনও বা, যে রঙের প্রয়োজন হয়, সেই রঙের জন্যে সবেগে ছুটে চলে যায় তাদের কেন্দ্রীয় থলিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন দেহকে লাল-এ পরিণত করার প্রয়োজন হয়, তখন শুধু লাল রঞ্জক পদার্থই সূক্ষ্ম শাখাগুলিকে অধিকার করে থাকে। যখন সবুজ রঙে নিজেদের গোপন করার প্রয়োজন হয়, তখন লালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং নীল ও হলুদ রঙের মিশ্রণকে অবাধ প্রবাহের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু রাত নামলেই লাল এবং হলদে রঙকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং ইশপ্ বাগদাদের 'নৈশ বেশ' অর্থাৎ নৈশ নীল-এর পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এটা এমন একটা পদ্ধতি, যা' সব সময়েই এই প্রাণীদের সরবরাহ করা হয়। আর তাদের এই অদৃশ্য হওয়ার বেশবাস সত্যিই ঈর্ষার যোগ্য হয়ে ওঠে।

বিস্ময়কর কাঁকড়া

বহু রকমের মাপ ও আকারবিশিষ্ট হয় এই কাঁকড়া পরিবার। আর বিভিন্ন প্রজাতিরও বটে। ছোট মটরের দানার মাপ থেকে বিরাট দৈত্যাকার অবধি। এদের প্রসারিত আটটি পা আছে।

সাঁতারু কাঁকড়ার বৃহত্তম গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ভেল্‌ভেট্ ফিড্‌-লার ক্র্যাব অর্থাৎ যার অঙ্গের বহির্ভাগ মখমলতুল্য এবং বাদ্যরত বেহালাবাদকের মতো আকারবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের কাঁকড়া। পুরুষেরা শিঙের মতো তীক্ষ্ণাগ্র বক্রনখরসম্পন্ন অসংখ্য দাঁড়া নিয়ে খেলা করে, এবং সেগুলি আন্দোলিত ক'রে স্ত্রী কাঁকড়াদের

আকর্ষণ করে। এমনভাবে দাঁড়াগুলো আন্দোলিত করে, যেন কোন বেহালাবাদক তার বেহালার ছড় টেনে বেহালা বাজাচ্ছে। এই অঙ্গভঙ্গীর জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে—ফিড্‌লার ক্র্যাব অর্থাৎ বেহালাবাদক কাঁকড়া। যদিও তার ভয়ংকর মেজাজের জন্য ফরাসী জেলেরা তার একটা উপনাম দিয়েছে—লা ক্রেব্ এন্‌রেজ (Le Crabe Enrage)।

রেড্ সিউইড্‌স্

রেড্ সিউইড্‌স্-এর (Red Seaweeds) অর্থাৎ লাল বর্ণের সামুদ্রিক আগাছা বা লতাপাতার আকর্ষণকারী দলটি হল,—করাালিনাসিয়া (Corallinaceae) অর্থাৎ প্রবাল-এর মতো লাল আগাছাবর্গ, যাদের কাণ্ডযুক্ত প্রধান ডালটি সমুদ্রের জলের তরল চুন এবং ম্যাগ্‌নেসিয়া, অর্থাৎ, এক মৌলিক ধাতব পদার্থ যা' দিয়ে ঔষধ প্রস্তুত হয় ও যা' দিয়ে পরিপৃক্ত বা সিক্ত হয়ে থাকে। কোর‍্যালিনাসিয়ার লাল আগাছাগুলির কাণ্ডে চুন এবং ম্যাগ-নেসিয়ার স্তর পড়ে পড়ে তাদের কঠিন এবং কণ্টকময় ক'রে তোলে। এমন কি তাদের আদি লাল এবং রক্তবর্ণকে সুন্দরভাবে ফিকে লাল-এ পরিণত ক'রে যেন তাদের মুখোস পরিয়ে রাখে। এই লালবর্ণের লতাপাতা দিয়ে ঔষধও প্রস্তুত হয়। যাকে বলে,—কর‍্যালিনা অফিসিনালিস্ (Corallina Officinalis)।

কর‍্যালিনা স্টেম্ অর্থাৎ প্রবাল-এর রঙের মতো প্রধান কাণ্ডযুক্ত ডালটি হল, বেলনাকার চুনাবৃত অংশ। অনেক সময় শাখাগ্রন্থিগুলিও

চুনাবৃত থাকে। যাই হোক, তাদের উচ্চতা এক থেকে পাঁচ ইঞ্চি অবধি দেখা যায়। আর ডালপালাগুলি স্বাধীনভাবে উপরের দিকে প্রসারিত হয়ে থাকে। সরু সরু পাখার আকারে অগণিত পালক-



রেড সিউইড্স্

গুচ্ছের মতো দেখায়। সমুদ্রতীর বরাবর খোলা জায়গায় যদিও এই করাালিনা বাস করতে ভালবাসে, কিন্তু বহুকাল যাবৎ এরা বেঁচে থাকতে পারে না; কারণ, চুনের বর্ম থাকলেও বড়ই স্পর্শকাতর এরা। সূর্যালোক স্পর্শে এরা শুকিয়ে যেতে থাকে।

এদের কঠিন এবং কণ্টকময় চেহারার জন্য অনেকে কর‍্যালিনা-বর্গকে প্রবালবর্গ বলে সনাক্ত করতেন; কিন্তু তাঁরা এটা ভুল

করতেন। কারণ, প্রবালবর্গ হল প্রাণীকুল। কেবলমাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই এর আসল পরিচয় পাওয়া যায়। কর‍্যালিনাবর্গ হল, সামুদ্রিক চারা গাছপালা এবং লতাগুল্মের মধ্যে সমুদ্র-শৈবাল পরিবারভুক্ত। একই সময়ে দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় ফুনাফুটি দ্বীপ-এ অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে দেখা যায় যে, এরা সমুদ্র-শৈবাল দলভুক্ত— যারা ঐ দ্বীপের প্রধান নির্মাতা। প্রবালবর্গ নয়। অবশ্য এও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রবাল-প্রাচীর এবং প্রবাল-দ্বীপ এখনও জন্ম নিচ্ছে। বিরাট কর্মসাধনে তৎপর এইসব উৎসাহী আগাছা এবং লতাপাতাকে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। উষ্ণমণ্ডলীয় সাগরগুলিতেও কর‍্যালিনাবর্গের জন্ম নিতে কোন মানা নেই। ইউরোপেও বহু প্রজাতির কর‍্যালিনাবর্গ দেখা যায়। ব্রিটেনের শিলাময় সমুদ্রোপকূলে কর‍্যালিনা অফিসিনালিস্ হল খুব সাধারণ অধিবাসী।

কর‍্যালিনাবর্গের অপর একটি প্রজাতি হল,—লিথোথাম্নিয়ন্ (Lithothamnion), যারা কর্ণওয়াল, কন্নেমারা এবং হীব্রাইড্স্ অঞ্চলে 'কর‍্যালস্যাণ্ডস্' অর্থাৎ প্রবালের মতো লাল বালুকারাশির সৃষ্টি করেছে। এইসব বালুকায় চল্লিশ থেকে আশি ভাগ অবধি চুন-এর ভাগ থাকে। কৃষিবিদ্‌রা অ্যাসিড্‌যুক্ত মাটিকে চাষোপযোগী করার জন্য এই চুন ব্যবহার করেন।

রেড্ টাইড্

রেড্ টাইড্ (Red Tide) হল প্ল্যাংক্টন্ জাতীয় এক প্রকার ভয়ংকর সূক্ষ্ম চাবুকের মতো লতাগুল্ম। এরা হঠাৎ এমন দলবদ্ধভাবে বংশবৃদ্ধি করে, যা' বর্ণনা করাসাধ্য নয়। জলের উপরের স্তরে পরমাণু বিস্ফোরণের ছত্রাক-এর মতো স্ফীত হয়ে ওঠে। এদের দেহের প্রাকৃতিক লাল রঞ্জক পদার্থগুলি জলকে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের মতো রাঙিয়ে তোলে। ফলে, এক আকর্ষণীয় অস্বাভাবিক আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে এর নাম হয়েছে—রেড্ টাইড্ অর্থাৎ লাল তরঙ্গ। এই অদ্ভুত লাল তরঙ্গের আবির্ভাব হয় নির্দ্দিষ্ট সময় বাদে-বাদে। এদের দেখা যায় ভারতবর্ষে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায়, ফ্লোরিডায় এবং ক্যালিফোরনিয়ায়।

লাল যদিও বিপদের সংকেত,—মাছ, কাঁকড়া এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীরা এই দূষিত জলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়লে এরা তখনই মারা যায়। হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, নয়তো বিষপ্রভাবে। কারণ, কিছু ডাইনোফ্লেজলেট্স্ (Dinoflagellates) অর্থাৎ ভয়ংকর সূক্ষ্ম বেতের মতো লতাগুল্ম জলে মিশ্রণযোগ্য শক্তিশালী টক্সিন্ অর্থাৎ টোমেইন্ বিষ বা পচা মাংস থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত উপক্ষার সৃষ্টি ক'রে দোষমুক্ত জলকে মারাত্মক দূষিত জলে পরিণত করে। এমন কি, মানুষও এর থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে না। ঝিনুক বা অনেক দ্বিপুটক খোলাযুক্ত মাছ বা এক প্রকার নরম এবং লম্বা মাছ আছে যারা এই চাবুকের মতো লাল লতাগুল্ম খায়, কিন্তু বিষপ্রভাবে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। তবে, তাদের আবার যারা খায়,

বিষপ্রভাবে তাদের অসাড় অবস্থা হয়ে যায়, নয়তো তারা মারাও যায়। এই কারণে ক্যালিফোরনিয়ায় রেড্ টাইড্ ঋতুতে এই সব দ্বিপুটক খোলাযুক্ত মাছ শীকার করা—আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি এই পথেই ঝিনুক আর দ্বিপুটক খোলাযুক্ত মৎস্যকুলকে তাদের ভাণ্ডার পরিপূরণ করতে অনুমতি দান করেছে।

ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে এই রেড্ টাইড্-এর আবির্ভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মৎস্যকুল যদিও বিরাট সংখ্যায় মারা পড়ে, তবে মানুষের অসুস্থতা সম্বন্ধে এখনও কিছু শোনা যায়নি। আরো মজার ব্যাপার হল, পনেরশো সাত খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্নানোর-এর বন্দী এবং উপবাসরত পর্তুগীজ দুর্গরক্ষী সেনাবাহিনীকে এই রেড্ টাইড্ই জীবনরক্ষা করেছিল। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাই এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বলা চলে। একটি গল্পও শোনা গিয়েছিল যে, যখন তারা ইঁদুর ও অন্যান্য চতুষ্পদ সরীসৃপের খাদ্যে পরিণত হয়ে আসছিল, তখন তারা কুমারী মেরীর কাছে প্রার্থনা জানাতে সুরু করে। দিনটা হল পনেরই আগষ্ট—রেড্ টাইড্-এর ঋতুকাল তখন। হঠাৎ দেখা যায়, অসংখ্য মৃত মৎস্য এবং কাঁকড়া সমুদ্রতটে ছড়িয়ে আছে।

রেড্ টাইড্ নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, যে পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘটে, বা যে সময়টা তাদের আবির্ভাবের অনুকূল—সেটা মনে হয়, ভারী গ্রীষ্মকালীন বর্ষা, যা' লক্ষ লক্ষ টন বিশুদ্ধ জল ধুয়ে নিয়ে মেক্সিকো উপসাগরে ফেলে। আর পশ্চিমা ঝড়, যা' এই জলকে তীরে ধরে রাখে; এবং মধ্য ফ্লোরিডার ফস্‌ফেট্ খনি থেকে নদী-

গুলি যে ফস্‌ফেট্ বহন করে নিয়ে আসে এবং জলের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এইসব অবস্থা যখন একসঙ্গে ঘটতে থাকে তখনই দেখা যায়, এই রেড্ টাইড্-এর উৎপাত। হাজার রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এদের উৎখাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু কোনটাই কাজে আসেনি।

এইসব লাল সিউইড্‌স্ আবার ঔষধপত্র, সার, এবং আগার-আগার-এর সজীব উৎস—আগার-আগার হল, জেলীর মতো এক-প্রকার সার, যা' রোগজীবাণু গবেষণার একটি মাধ্যমে এবং যা' দৃঢ়ী-করণের পক্ষেও এক শক্তিসম্পন্ন মাধ্যম। এটা মালয় দেশের কথা।

সমুদ্রের লতাগুল্মের বাগানে অথবা অগভীর জলের শিলাময় জলাধারগুলিতে কন্‌ড্রাস্ ক্রিস্‌পাস্ নামক লতাগুল্ম প্রচুর জন্মায়। গত একশো বছর ধরে এই লতাগুল্ম প্রচুরভাবে কাসির মিক্‌স্‌চার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একে সুস্বাদু করার জন্যে এর সঙ্গে কোকো, লেবু, এবং অন্যান্য সুগন্ধিপূর্ণ জিনিস মেশানো হয়।

কৃষিবিদ্‌রা দেখেছেন যে, এই সব লতাগুল্ম সার হিসাবে খুব কার্যকরী দুটি কারণে: এদের মধ্যে যে নাইট্রোজেনের ভাগ আছে, তা' খামারের সারের সমান, আর এর সঙ্গে যে পটাশ যোগ করা হয়, তাও প্রায় দ্বিগুণভাবে আছে। এই সব লাল সিউইড্‌স্-যাদের প্রাকৃতিকভাবে শীতলীকৃত করে ঘনীভূত করার শক্তিও আছে। তাছাড়া, হালকা বালি মাটির জলধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সামর্থ্যও এদের আছে।

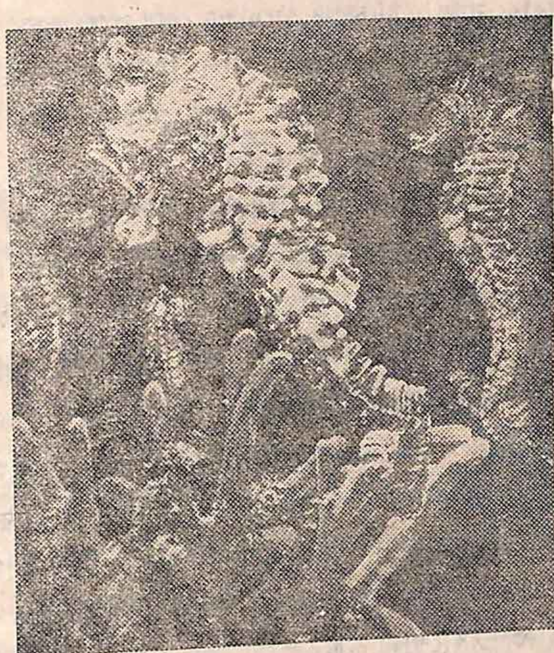
ঔষধ এবং সার ছাড়া এই সব সিউইড্‌দের আরো একটা জিনিস উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে—যাকে বলে আগার-আগার, অর্থাৎ

জেলীর মতো পদার্থ যা' মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। রোগজীবাণু এবং ছত্রাক বৃদ্ধির জন্য যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের কাজ করে। এটা ঠিক জেলীর মতো বসে যায়। আর এদের উপরে যে-সব প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মায়, তারা এটা খায়ও না। আঠা এবং কাগচ তৈরীর ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহৃত হয়। যেমন,—মৎস্য সংরক্ষণ, তন্তু এবং চর্ম সামগ্রী সম্পাদন, প্রসাধন সামগ্রী নির্মাণকার্য, আইস্‌ক্রীম ঘনীভূত করণ এবং মৃদু দাস্ত পরিষ্করণ প্রভৃতি।

সি হর্সে স্‌

সি হর্স (Sea Horse) হল, জলহস্তীর মতোই একজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী। যাকে বলা হয়, সি হর্স অর্থাৎ সামুদ্রিক জলঘোটক। এদের আবার হিপ্পোক্যাম্‌পাস্‌ও (Hippocampus) বলা হয়। বাদামী রঙের সামুদ্রিক আগাছার মধ্যে এরা বাস করে। এরা এক ছোট্ট আকর্ষণকারী প্রাণী। কথিত আছে, এরা সমুদ্র-দেবতার রথ টানে। এদের মাথাটা দেখতে ঘোড়ার মতো এবং লেজটা মাছের মতো। সব অদ্ভুত জিনিসের মতোই এদের দেহটাও এক অদ্ভুত জিনিস। এদের মাথাটা সমকোণের মতো বাঁকানো, যা' ক্রমশঃ সরু হয়ে যাওয়া দেহের দিকে কাৎ করা থাকে। এদের অদ্ভুত দেহটা আংটির মতো গোলাকৃতি অস্থি দিয়ে মাথা থেকে লেজ অবধি সাজানো—যা' এদের দেহকে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছে। আর এদের দেখতে লাগে যেন প্রাচীন ফ্যাশান্‌যুক্ত নাইট্‌দের অস্ত্রসজ্জিত এক তেজী ঘোড়া।

অন্যান্য মাছ যেমন মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে দেহটা ভাসিয়ে জলেতে সাঁতার কাটে, এই সি হর্স বা সামুদ্রিক জলঘোটক কিন্তু



সি হর্সেস্

সেভাবে সাঁতার কাটে না। এরা দণ্ডায়মান অবস্থায় সাঁতার কাটার উপর জোর দেয় বেশী। এদের মাথাটাকে উঁচু করে তুলে ধরে লেজটাকে নিচের দিকে প্রসারিত করে দেয়। এই লেজের এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। লেজ দিয়ে এরা নঙ্গরের কাজ করতে পারে। লেজটি বাদ দিলে থাকে ডানা, যা' বেশির ভাগ মাছেরই থাকে, আর যেটি কোনো আটকে থাকা জিনিস বা চলন্ত জিনিস আঁকড়ে ধরতে পারে,

এবং তাই দিয়েই আঁকড়ে ধরে, যদি এরা বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে।

আবার যখন এরা চলার প্রয়োজন বোধ করে, তখন নঙ্গর খুলে দেয় এবং বক্ষোবর্তী ডানাগুলি জলে ক্ষিপ্রভাবে আঘাত ক'রে নিজেদের দেহটাকে চালিত করে। তখন মোটর-বোটের ঘূর্ণায়মান প্রপেলর-এর পাখার মতো দেখতে লাগে। যখন মনে হয় এরা অবসর নিচ্ছে, তখন কিন্তু আসলে তারা শিকার ধরার কথা চিন্তা করছে— কিভাবে তাদের দেহটা সন্দেহহীন দ্বিপুটক প্রাণী বা অল্প খোলাযুক্ত মাছের উপর ন্যস্ত করবে। দু'এক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শিকারকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করে, তারপরেই সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি ক'রে সতর্কতার সংকেত না দিয়েই তার খাদ্য গলাধঃকরণ করে। প্রথমে অবশ্য চোষার মতো চোঁ ক'রে মুখে টেনে নেয়।

সি হর্স অর্থাৎ সমুদ্র-জলঘোটকের অপ্রচলিত খাওয়ার অভ্যাস, তার অস্বাভাবিক প্রজনন পদ্ধতির সঙ্গে সমানভাবে মিলে যায়। পাপা সি হর্স অর্থাৎ পুরুষ জলঘোটকের—ডিম বা ডিম ফোটার পর ছোট ছোট বাচ্ছা দেখাশোনা করার পুরো দায়-দায়িত্ব। প্রজনন ঋতুতে বিশেষ ডিমের থলি—যা' ডিম গ্রহণের জন্য থাকে তাদের লেজের নিচে, তা' উর্বর করা এবং সেবা করার মধ্যেই তারা সময় কাটায়। একই সময়ে মামা সি হর্স অর্থাৎ স্ত্রী জলঘোটকী বিশেষভাবে বর্দ্ধিত একটি নলের সৃষ্টি করে—আর সেই নল দিয়ে তার ডিমগুলি পুরুষ জলঘোটকের ডিমের থলিতে চালান করে দেয়।

সেই থলিতেই ডিমগুলিকে তা' দিয়ে দিয়ে ফুটিয়ে বেবী সি হর্স অর্থাৎ শাবক-জলঘোটকে পরিণত করা হয়। শাবকগুলি সেখানেই

থাকে, যতক্ষণ না নিজেদের নিজেরা দেখাশোনা করার মতো সমর্থ হয়। এটা হল, অবশ্য-প্রয়োজনীয় কারণ, একবার থলি থেকে বেরোলে, তারা আর সেই পূর্বের আশ্রয়ে ফিরে যেতে পারে না। থলির মুখটা এত ছোট।

আবহাওয়া কাঁচ

বাদামী সিউইড্-এর বৃহত্তম দলটির মধ্যে একটি ল্যামিনারিয়ান্স্ অথবা কেল্প্স্ (Laminarians or Kelps) নামে পরিচিত। আর বাকি তিরিশ রকমের মধ্যে ল্যামিনারিয়া স্যাকারিনা অথবা সি বেল্ট (Laminaria Saccharina or Sea Belt) খুব বেশী পরিচিত। কারণ, সমুদ্র তীরবর্তী বাসিন্দারা আবহাওয়া ঘোষণার জন্য এইটাকেই সাধারণভাবে ব্যবহার করে।

কৌশলটা কিন্তু খুবই সাধারণ। যখন চারিদিকের বাতাস শুষ্ক থাকে, ল্যামিনারিয়া স্যাকারিনার পর্ণরাজি শুকিয়ে যায় এবং পলকা হয়ে যায়। কিন্তু বর্ষার আগমনে চারিদিকের বাতাস জলকণায় পূর্ণ হয় এবং নরম হয়ে আসে ও আঠালো হয়ে ওঠে। এটা ঘটে এই কারণে যে, এদের কোষের গাত্রে কিছু সারপদার্থ থাকে, যা' জলকণা স্পৃষ্ট হওয়ামাত্র প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তারা এই জলকণাকে লেপটে ফেলে এবং পাতাও নরম এবং আঠালো হতে থাকে। আবার যখন শুকিয়ে যায় বাতাস—পাতাও শুকোতে থাকে এবং পলকা হয়ে যায়। এদের কোষের এই সারাংশকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কেননা, এই সি বেল্টের দল গরীব লোকেদের আবহাওয়া কাঁচ-এর কাজ দিয়ে থাকে।

ফিউকেল্স্ বা র‍্যাক্স্

ফিউকেল্স্ (Fucales) হল, সৈকতোপরি নিক্ষিপ্ত সমুদ্রজ গুল্ম —যার পাতা চ্যাপ্টা এবং চামড়ার মতো। সাধারণভাবে এদের বলা হয় র‍্যাক্স্ (Wracks)। প্রায়ই সমুদ্রতটে শান্তিপূর্ণ ভ্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, পপ্ গান-এর অর্থাৎ খেলনা বন্দুকের মতো ফট্-ফট্ শব্দে। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই এই শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই সতর্ককারী শব্দগুলোই শুধু নির্দেশ করে যে, বাদামী সিউইড্স্ পথের উপরে এসে পড়েছে। যারা ব্লাডারর‍্যাক্ (Bladder Wrack) বা ফিউকাস্ ভেসিকিউলাসিস্ (Fucus Veciculasis) নামে পরিচিত এবং যাদের বায়ুপূর্ণ থলিগুলি পায়ের তলায় ফাটতে সুরু করেছে। এই বায়ুপূর্ণ থলিগুলি, যেগুলি বেলুনের মতো ফুলে থাকে, যাদের পক্ষে মৃদু চাপই যথেষ্ট, একটু চাপেই ফট্‌ফট্ শব্দে ফাটতে থাকে।

বাদামী সিউইড্স্-এর খুব সাধারণ দলের সভ্যবৃন্দ হল, ব্লাডারর‍্যাকস্—যাদের ফিউকেল্স্ অথবা র‍্যাক্স্ বলে, এবং যাদের সুমেরু বা উত্তরমেরু থেকে কুমেরু বা দক্ষিণমেরু অবধি প্রায় প্রত্যেক শিলাময় উপকূলেই দেখা যায়। প্রকৃতিগতভাবে খুঁতখুঁতে এই র‍্যাকদের অত্যন্ত বদ্ধ ধারণা আছে যে, কোথায় তারা বাস করতে চায়। স্পাইরাল্ র‍্যাক্ অর্থাৎ প্যাঁচানো র‍্যাক্ এবং টুথ্ড্ র‍্যাক্ অথবা দাঁতালো র‍্যাকেরা উপকূলের দুই প্রান্তে বাস করে। উপকূলের মাথায় যেখানে কেবল বড় ঢেউগুলোই পৌঁছতে পারে, স্পাইরাল্ র‍্যাক্দের (Spiral Wracks) বাড়ী হল সেখানে। আর টুথ্ড্

র‍্যাক্স্ (Toothed Wracks) জলের কাছাকাছি বাস করতে পছন্দ করে, যেখানে ছোট ছোট ঢেউয়ের সীমানা। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করে ব্লাডাররর‍্যাক্স্। বাদামীগুলোকে বাছাই ক'রে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করার কাজকে বলা হয়, জোনেশন্ অর্থাৎ অঞ্চল গঠন। আর শিলাময় উপকূলে বাসকারী সিউইড্দের মধ্যে এই বাছাই কাজ খুব সাধারণ ব্যাপার।

কাঠামোগতভাবে যদিও সব র‍্যাক্রাই সমান, তবে প্রত্যেক শ্রেণীরই বিশেষ আকার আছে, যা' তাদের নামকরণে সাহায্য করেছে। এক জাতের হলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে বৈকি! উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—যেমন, ব্লাডাররর‍্যাক্দের ব্লাডার, টুথ্ড র‍্যাক্দের খাঁজকাটা করাতের মতো ধারগুলো, যাদের আবার বলা হয়, ফিউকাস্ সেরাটাস্ (Fucus Serratus), আর স্পাইরাল র‍্যাক্দের মুছড়ে বাঁকানো প্যাঁচানো আকারের দেহ, যাদের আবার বলা হয়, ফিউকাস্ স্পাইরালিস্ (Fucus Spiralis)।